

# আমি কেউ না

## সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়



BanglaBook.org



**জ**ন্না : ২১ ভাদ্র। ১৩৪১ (৭ সেপ্টেম্বর,  
১৯৩৪)। ফরিদপুর, বাংলাদেশ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ। টিউশনি দিয়ে  
কর্মজীবনের শুরু। তারপর নানা অভিজ্ঞতা। বর্তমানে  
‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র সঙ্গে যুক্ত।

শখ : ভ্রমণ। দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেছেন।

‘কৃতিবাস’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক।

প্রথম উপন্যাস : ‘আত্মপ্রকাশ’। শারদীয়া ‘দেশ’

পত্রিকায় প্রকাশিত।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ : ‘একা এবং কয়েকজন’। ঠিক এই  
নামেই তিনি পরে একটি উপন্যাস লিখেছেন।

ছেটদের মহলেও সমান জনপ্রিয়তা। প্রথম কিশোর  
উপন্যাস—‘ভয়ংকর সুন্দর’। ছফ্ফনাম ‘নীললোহিত’।  
আরও দৃঢ় ছফ্ফনাম—‘সনাতন পাঠক’ এবং ‘নীল  
উপাধ্যায়’।

আনন্দ পুরক্তার পেয়েছেন বহু আগে।

১৯৮৩ সালে পান বাক্তিম পুরক্তার। সাহিত্য আকাদেমি  
পুরক্তার, ১৯৮৫-তে।

গ্রন্থ-সংখ্যা : দ্বিতীয়িক।

একাধিক কাহিনী চলচ্চিত্রে, বেতারে ও টিভির পর্দায়  
রূপায়িত ও পৃথিবীর নানা ভাষায় অনুদিত।

# আমি কেউ না

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়



এ্যানি প্রকাশন

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশনায় :  
এ্যানি প্রকাশন  
বাংলাবাজার  
ঢাকা-১১০০

বাংলাদেশ সংস্করণ  
জুলাই-১৯৯৪ ইং

মুদ্রণেঃ  
নিউ কাউসার প্রেস

মূল্য : ৫৫.০০ টাকা মাত্র।



বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

---

নানারকম নতুন / পুরাতন  
বাংলা বই এর পিডিএফ  
ডাউনলোড করার জন্য  
আমাদের ওয়েবসাইটে  
**(BANGLABOOK.ORG)**  
আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

---

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :



একটা নতুন দিন, ঘূম ভাঙার পর প্রথম চোখ মেলে দেখা দিন, সবচেয়ে সুন্দরভাবে  
গুরু হতে পারে কী করে?

বৃষ্টি ভোর হ্যাঁ, বৃষ্টি আমার খুবই পছন্দ ঠিকই, সকালবেলা বৃষ্টির শব্দ শুনতে  
আমার ভালো লাগে, কিন্তু সেটা অভিন্ব কিন্তু নয়। অপ্রত্যাশিত নয়। বহুরে বেশ  
কয়েকদিন এরকম তো দেখাই যায়। এমনকি এক-একদিন বৃষ্টি হয়, তবু আমরা দেখি  
না। ওঃ, বৃষ্টি পড়ছে, এই বলেই আমরা অন্য কাজে মন দিই।

কেউ ধোঁয়া-ওঠা চা নিয়ে এসে ঘূম ভাঙালেও ভালো লাগে; সারা রাত টেন জার্নির  
পর ভোরবেলা কোনো হোট স্টেশনে সুরেলা চা-ওয়ালার ডাক, মাটির ভাঁড়ে চা, একটু  
দূরে এটা ক্ষণচূড়া গাছ থেকে ঝিরিঝিরি করে ঝরে পড়ছে লাল লাল পাপড়ি, এতে বেশ  
চমৎকার।

কিন্তু কোনোদিন যদি ঘূমন্ত চোখের ওপর একটি কিশোরী মেয়ে এসে তার ডান  
হাতখনি রাখে?

আমি বোধ হয় কিন্তু একটা স্বপ্ন দেখছিলাম। ভোরের স্বপ্ন পলকে পলকে বদলায়।  
হঠাৎ মনে হলো, আমার চোখের ওপর কয়েকটা চাঁপা ফুল। সেই রকমই স্পর্শ এবং  
গন্ধ। তার পরেই বুঝালাম, ফুল নয়, চম্পক বর্ণ কয়েকটি আঙুল।

আমার চোখের তারা কাঁপলো, স্বপ্ন ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মিহিন রেণুর মতন মিশে  
গেল বাতাসে। প্রথমে ভাঙলো শুধু চোখের ঘূম, তখনও হাত, পা, বুক, চুলের ডগা পর্যন্ত  
ঘূমিয়ে আছে। চোখ মেলে তাকালাম। আঙুলগুলির ফাঁক দিয়ে দেখা গেল, খুব কাছেই  
ঝুকে আছে একটি মুখ, এক কিশোরীর মুখ, সেই মুখে সোনার দীপ্তি, বিস্ময় ভরা দুটি  
চোখ, সব কিশোরীর চোখেই বিস্ময় মাখানো থাকে, জ্যোৎস্না রঙের কপাল, ভুক দুটি  
উড়ত পাখির মতন, তার ঢোঁটে অতি স্বচ্ছ ঝর্নার জলের মতন হাসি, তার চিমুকে ব্যস্তের  
নতুন পাতার মসৃণতা।

কে এই অপূর্ব কিশোরী? আমি তো চিনি না।

এখনও কি তা হলে স্বপ্ন চলছে? এত সকালে, আমার ঘরে, একটি অচেনা ঝুপসী  
মেয়ে কী করে আসবে, কেন সে এত কাছে এসে আমার মুখের দিকে ব্যগ্রভাবে চেয়ে  
থাকবে?

এবারে আমার কপাল ও ওষ্ঠের ঘূম ভাঙলো, ডান হাতটা নড়ে উঠলো। সারা শরীর  
ছেড়ে চলে যাচ্ছে ঘূম তবু মেয়েটিকে দেখতে পাচ্ছি সে অলীক নয়; আমি হাত তুলে  
তাকে স্পর্শ করলাম। সে এক বাস্তব নারী একটা অসম্ভব তালো লাঞ্ছিড়িয়ে গেল  
আমার শরীরে।

এমন সুন্দর একটি মেয়ে নিজে থেকে এসেছে আমার কাছে<sup>১</sup>সে কি তবে আমার  
এই বিড়ালিত জীবনে একটি অলৌকিক উপহার? তাহলে ওষ্ঠে কাছে টেনে নিই? ওকে  
আদর করি? কেন নয়? দারুণ ইচ্ছে হলো, ওর এ ওষ্ঠের অমৃত একটু চেবে দেখি।

মেয়েটি বললো, অ্যাই ঝু, আর কত ঘুমোবে?

যেই গলার আওয়াজ শুনলাম, অমনি ঘোর জেন্ট গেল।

এ তো মুমু! অচেনা কেন হবে, ওকে তো ঝোয় জন্ম থেকে দেখছি! যাঃ, অলৌকিক  
উপহার-টুপহার কিন্তু নয়। মুমু এসে তো আমাকে ডাকতেই পারে। তবু এতক্ষণ ওকে

চিনতে পারিনি কেন? ওকে অন্যরকম দেখাচ্ছে। কিংবা আমি কথনও শয়ে থাকা অবস্থায় মুমুর অমন ঝুঁকে-পড়া মুখ দেখিনি। শুধু তাও তো নয়। মুমুকে বেশ বড় দেখাচ্ছিল, প্রায় যুবতীর কাছাকাছি, তার চোখ দুটি বালিকার নয়, নারীর মতন। আসল সবই ঘুমের ঘোর।

আমি খালি গায়ে, পা-জামা পরে শুই। চা খাওয়ার আগে বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না বলে দরজায় ছিটকিনি দিই না। আমি ভাড়াতাড়ি একটা চাদর টেনে নিলাম গায়ে। বউদি চা দিতে এলেও এরকম গায়ে চাদর দিই। আমি মেয়েদের কাছে কঙ্কনো খালি গায়ে থাকি না। কারণ মেয়েরাও তো আমার সামনে খালি গায়ে আসে না। পারস্পরিক ব্যবহার সমান সমান হওয়া উচিত।

মুমু খাটের ওপর আমার পাশে বসে বললো, বাবাঃ, কী ঘুম ঘুমোতে পারো!

মুমু একটা গোলাপি ফুক পরে এসেছে, হাতদুটিতে লেস বসানো, বুকের কাছেও লেসের কারুকাঙ। মুমুকে আজ সত্য শুন্দর দেখাচ্ছে। যেন একটা স্বর্গের পরী।

আমার ইচ্ছে করলো, ওর কোমর ঝড়িয়ে ধরে আদর করি।

অ্যাঃ সে কি কথা! মুমু যে আমার ছেট বোনের মতন! ওর সঙ্গে আমার ইয়ার্কির সম্পর্ক। সবাই জানে মুমুকে আমি খুব মেহ করি। মুমুর সঙ্গে আমি একা একা কত জায়গায় ঘুরেছি, ওকে নিয়ে শুভনিয়া পাহাড় গেছি, ওদের বাড়িতে আমি ঘরের ছেলের মতন ব্যবহার পাই।

কিন্তু আমার ইচ্ছে হচ্ছে, এটা অতি তীব্র সত্য কথা, দারুণ ইচ্ছে হচ্ছে, হাত দুটি বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরি ওর কোমর, ম্যাগনোলিয়া গ্র্যান্ডিফোরা গাছে ফুটেছে একটি মাত্র ফুল, ও সেই ফুলটির মতন অপরপ, পরিত্র, ওর শরীরের দ্রাঘ নেবার জন্য ওর বুকের মাঝখানে রাখি আমার মুখ! সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গার পর, এত কাছে এই এক কিশোরী, যে নিজে থেকে আমার কাছে এসেছে, ওকে আদর না করলে যেন আমার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যাবে!

আমার হাত দুটি উঠছে, এগিয়ে যাচ্ছে মুমুর কোমরের দিকে যেন আমার হাতের ওপর আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, ওদের ইচ্ছে অনিচ্ছে আছে, হাত দুটি চাইছে মুমুর কোমর, চোখ দুটি চাইছে মুমুর শেষ, নাক চাইছে মুমুর বুক।

নিজেকে এবার প্রচণ্ড ধর্মক দিলাম। ছিঃ নীলালোহিত, এ সব কী ন্যাকামি হচ্ছে! আর কেউ নয়, ও তো মুমু ওর সম্পর্কে এই ধরনের চিন্তা করলেও তোমাকে জুতো মারা উচিত। ওঠো, উঠে পড়ো!

তড়ক করে লাফিয়ে নেমে গেলাম খাট থেকে;

তবু ঘোর কাটছে না মুমু গ্রীবা উচু করে চেয়ে আছে আমার দিকে তার টলটলে চোখ দুটি যেন ভূমধ্যসাগরের দুচামচ জল। এই উপমাটা অন্য কারুর প্রত্যেক কি না কে জানে, কিন্তু এই ছাবিটাই মনে এলো একটুও ভাজহীন প্রকৃকপাল। এক শুচ্ছ রজনীগঙ্কার মতন চুল, রজনীগঙ্কা কালো হয় না, কালো রংএর কেমন ফুলই দেখিনি, তবু ওর চুল যেন ফুলেরই মতন, ঢেঁট দুটিতে একটু একটু দ্রুত মাঝখানে হাসি, একদিকের গালে এসে পড়েছে সকালের তাপহীন রোদ, তার বুকে পৰীর চেউ। মুমু যেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কিশোরী। না, কিশোরী নয়, কোনো মন্তবলে অঞ্জ সকালেই সে কিশোরী থেকে যুবতী হয়ে গেছে।

এখনও ওকে দুঃহাতে টেনে নিয়ে আদর করার জন্য আকুলিবিকুলি করছে আমার বুক।

কথা বললে ঘোর কেটে যাবে ।

দু'হাতে নিজের চোখ দুটো ঘষে মিলাম ভালো করে । তারপর যতদ্বয় সঙ্গে হাতাবিক গলায় জিজেস করলাম, কী রে, মুমু, এত সকালে?

মুমু বললো, আমি ঘোড়ায় চড়া শিখবে!!

অপ্রত্যাশিত কথা বলতে মুমুর জুড়ি নেই ।

কেউ যদি ঘোড়ায় চড়া শিখতেই চায়, তা হলে ভোরবেলা এসে সেটা আমাকে জানাতে ইবে কেন? আমি কি ঘোড়া? কোনো কোনো বাড়িতে দেখেছি বটে, দাদুরা মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে ঘোড়া সাজে, নাতি-নাতনীরা তাদের পিঠে চেপে হ্যাট হ্যাট করে । আমার পক্ষে তো দাদু সাজা সঞ্চ নয় । তার আগে আমাকে বাবা হতে হবে । বাবা না হয়েও কেউ কি একলাকে দাদু হয়ে যেতে পারে?

মানুষ-ঘোড়ার পিঠে চাপার মতন বাক্তা ও নেই মুমু ।

আমার খাটের পাশে এক গেলাস জল ঢাকা দেওয়া থাকে । চুমুক দিয়ে সেই জলটা শেষ করে বললাম, দার্জিলিং যাচ্ছিস?

মুমু বললো, না তো! এখন ছুটি নেই, দার্জিলিং যাবো কেন?

আমি বললাম, সবাই তো দার্জিলিঙে গিয়েই ঘোড়ায় চাপে ।

মুমু বললো, তুমি কিছু জানো না । কলকাতার ময়দানেও ঘোড়া ভাড়া পাওয়া যায় ভোরবেলা অনেকে দিয়ে শেখে । কিন্তু বাবা কি আমাকে একলা যেতে দেবে? বাবার সময় নেই । তুমি আমাকে রোজ নিয়ে যাবে!

এর উত্তরে আমার বলা উচিত ছিল, কেন, লালুদা? লালুদাই তোকে রোজ নিয়ে যেতে পারে । লালুদার গাড়ি আছে ।

ঠাঁটের ডগা থেকে এ কথাটা ফিরিয়ে দিলাম । ঐ লালুদা আছাদে রাজি হয়ে যাবে, ঐ লালুদা মুমুর সঙ্গে থাকবে, বাসস্লেয়ের ছুটোয় মুমুর কাঁধে হাত রাখবে, অন্যমনক্তার ভান করে বুক ছুঁয়ে দেবে, ওঃ, এই দৃশ্য ভাবতেই আমার মাথায় আগুন জলে উঠলো ।

বউদি দু' কাপ চা নিয়ে ঘরে চুকে বললো, আজ কিন্তু তোমায় বাজারে যেতে হবে, মীল!

বউদির সঙ্গে নিশ্চয়ই মুমুর আগেই দেখা হয়েছে, তাই অবাক হলো না । দু' কাপ চা, আমাদের বাড়িতে মুমুকে তো কোনোদিন চা দেওয়া হয় না । তাকে দেওয়া হয় এক গেলাস দুধ । মুমু শুধু দুধ খেতে চায় না বলে মাঝে মাঝে সেই দুধের সঙ্গে খানিকটা কোকো মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে এক-একদিন । নিজের বাড়িতেও চা খায় না মুমু । ক্ষুলে পড়ার বয়েস পর্যন্ত ছেলে-মেয়েদের চা দেবার রীতি নেই ।

মুমু আগেই বউদির কাছে চা চেয়েছে, দিবি চায়ের কাপ তুলে চুমুক টুল । সত্যই তা হলে বড় হয়ে গেছে মুমু?

বউদির সকালে ইঙ্গুলি দুটো-একটা কথা বলেই চলে গেল ঘোড়াতাড়ি ।

মুমু চা শেষ করে বললো, মীলকা, তাহলে কথা রইলো, কাল থেকে তুমি আমায় ময়দানে নিয়ে যাবে । তুমি আমাদের বাড়িতে যাবে, মু আমি এসে তোমায় ডেকে তুলবো?

— ক'টাৰ সময় যেতে হবে?

— সাড়ে পাঁচটাৰ মধ্যে ।

— এত ভোরে কোনোদিন জাগি না যে আমি!

— অ্যালার্ম ঘড়ি নেই? আমাদের বাড়িতে আছে, তোমাকে পাঠিয়ে দেবো। বেলা হয়ে গেলে রোদ চড়া হয়ে যায়। তা ছাড়া, সাতটার মধ্যে ফিরে এসে আমায় পড়তে বসতে হবে না?

— ঘোড়ায় চড়া শিখে কী হবে?

— লোকে সাঁতার শেখে কেন? ব্যাডমিন্টন খেলে কেন? এমন সব অঙ্গুত প্রশ্ন করো না তুমি! আমার ইচ্ছে হয়েছে, আমি হর্স রাইডিং শিখবো। তুমিও ইচ্ছে করলে শিখতে পারো। শুধু শুধু অতক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবে কেন?

— তারপর পাশাপাশি দুটো ঘোড়ায় চেপে আমরা তেপাত্তরের মাঠ পার হয়ে যাবো।

— তেপাত্তরটা কোথায়? আরব কান্ত্রিতে?

উন্নত না দিয়ে আমি মুমুর পায়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

এমনভাবে আমি ওর পা আগে কখনও দেখিনি। প্রতিটি আঙুল একেবারে নিখুঁত। মাথন-রঙের পা, মোখে লালচে আভা, অপূর্ব গোড়ালির গড়ন, এমন সুন্দর কি কোনো মানুষের পা হতে পারে? ঠিক যেন লক্ষ্মী প্রতিমার পা। মুমু খেলাধুলো করে, দস্যিপনা করে, ওর ধুলোমাখা পা-ই স্বাভাবিক হত। এ যে সোনার মতন ঝকঝকে।

ইচ্ছে হলো, এক্ষুনি হাঁটু গেড়ে বসে ওর পা দুটো দু' হাতে ধরি, একটা চুম্বন দিই।

ছিঃ, আবার এরকম ইচ্ছে না, না, না। মুমু কি আমার প্রেমিকা নাকি? সে একটা বাচ্চা মেয়ে, এখনও হায়ার সেকেভারি পাস করেনি, ওর সম্পর্কে এরকম চিন্তা করাও পাপ!

মুমু খাট থেকে নেমে পড়ে বললো, তাহলে ঐ কথাই রইলো? কাল প্রথম দিন, আমিই চলে আসবো। যদি ঘুমিয়ে থাকো, চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলবো কিন্তু!

দরজার বাইরে জুতো খুলে রেখেছে মুমু। তার মধ্যে লাল টুকটুকে মোজা। ও এখন সব সময় মোজা পরে, তাই পা এত পরিচ্ছন্ন।

আমার সঙ্গে মাস চারেক দেখা হয়নি, তার মধ্যে বেশ লম্বা হয়ে গেছে। রোগা রোগা ভাবটা কেটে গিয়ে সুগোল হয়েছে উরু, ভুরু দুটি গাঢ় হয়েছে।

ঈমৎ ঝুঁকে মুমু মোজা পরছে, আমার মনে হলো, এই দৃশ্যের ছবি আমি আগে কোথাও দেখেছি। ছবি নয়। মূর্তি। খাজুরাহোতে আছে। একটি তরঙ্গীর পায়ে কাঁটা ফুটেছে, সে এইরমক নুয়ে কাঁটা তুলছে। মুমুর পায়ের পাতায় কাঁটা ফুটলে আমি দাঁত দিয়ে তুলে দিতে পারি।

আমার মা এখন নিজের ঘরে ঠাকুর-দেবতার ছবির সামনে পুজোয় বসেছেন, এখন কথা বলবেন না। মুমু সে ঘরের চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে বললো, দিশা আমি যাচ্ছি!

তারপর সে পেছন ফিরলো। আমি তাকে পৌছে দিতে গেলাম সিঁড়ি-প্রবর্ত। মুমুর হাঁটার ভঙ্গি বদলে গেছে। চিরুক উঁচু করে রাজকুমারীর ভঙ্গিতে পুঁ ফেলছে। ওকে ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। ওর একটা হাত ধরে বলবো, আর একটা থাকো?

কিংবা একতলার সদর দরজা পর্যন্ত পৌছে দেবো?

মুমু সে সুযোগ দিল না। সিঁড়ির কাছে এসে বদলে গেল তার ভঙ্গি। প্রায় যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো।

— চলি, বু, কল্প যেন ঠিক মনে থাকে!

সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে গিয়ে, প্রথম বাক ঘোরার মুখে মুখ ফিরিয়ে হাসলো। এখন তার মুখখানি আবার সরল বালিকার মতন।

আমি কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম, সিঁড়িতে মুমুর পায়ের শব্দ এখনও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

দাদার কাগজ পড়া শেষ হয়নি, এখন বাথরুম আমার অধিকারে।

চোখে জল দিতে দিতে আমি আয়নার দিকে চেয়ে রইলাম। নিজেকে দেখতে পাচ্ছি না। মযদান, ভিকটোরিয়া, মেমোরিয়াল, রেসকোর্স....। ঘোড়ার পিঠে ছুটছে মুমু। বিশাল ওয়েলার ঘোড়া, মুমুর অঙ্গে জরির সাজ, মাথায় একটা মুকুট, কোমরে মণি-মানিক্য খচিত তলোয়ার।

এ যে রূপকথা হয়ে যাচ্ছে! না, রূপকথার রাজকন্যা হিসেবে মুমুকে মানবে না। মুমু এখনও শাড়ি পরে না, শালোয়ার কামিজ পরে না। কার্ট কিংবা জিন্স-এর প্যান্ট ওর পছন্দ। মুকুট-ফুকুট ও মাথায় দেবে না। জিনস আর টি শার্ট পরে ঘোড়া ছোটাচ্ছে মুমু। এরকমও রাজকন্যা হয়। ইংল্যান্ডের রাজকন্যারা এরকমই পোশাক পরে এখন।

কিছুদিন আগে একটা খবরের কাগজের রবিবারের পাতায় একটা ছবি দেখেছিলাম। বরোদার মহারাজের এক মেয়ে ঘোড়া ছোটাচ্ছে গুজরাতের কোনো সমুদ্রতীরে। সমুদ্রের দিকেই গোড়াটার মুখ। মেয়েটি যেন ঘোড়ায় চেপেই সমুদ্র পার হবে। সেই রাজকুমারীর চেয়েও মুমু অনেক সুন্দর।

মুমু অনেকটা লম্বা হয়েছে। না আমার সমান হয়নি, তবে ওর মাকে ছাড়িয়ে গেছে মুমু যদি আমার মুখোমুখি দাঁড়ায়, আমি একটা হাত ওর কোমরে, একটা হাত কাঁধে, ওকে টেনে আনি বুকের কাছে, তা হলে থুতনিতে ঠেকবে ঠিক আমার বুকের মাঝখানে। ওকে চুমু খাওয়ার জন্য আমার মুখটা একটু নিচু করতে হবে। বেশি না, এই তো একটু খানি, ভোরবেলার নদীর মতন মুমুর চোখে দু' হাত বাড়ানো আমন্ত্রণ, ছলাং ছলাং শব্দের মতন বলছে, এসো, এসো। এই দেবদুর্লভ ওষ্ঠ, এই অমৃত আজও কেউ স্পর্শ করেনি, আমিই প্রথম, আমি ছাড়া আর কেউ নয়..।

তুমি কি পাগল হয়ে গেলে, নলিলোহিত? সকালবেলাতেই মাথায় এইসব কু চিন্তা! তা ছাড়া ও যে দুমু, মুমু, তোমার মাথায় ঢুকছে না এখনও? চন্দনদা-দীপা বৌদির মেয়ে মুমু, তোমার থেকে কত ছোট!

জানি, সব জানি! ও আমাদের সকলের মেহের মুমু। কিন্তু আজ সকালে চোখ মেলেই মুমুকে দেখে যে আমার বুক কেঁপে উঠলো! মনে হলো, মুমু সম্পূর্ণ বদলে গেছে, যেন কমলকলি ফুটে উঠেছে আপনি আপনি। আমি ওর থেকে চোখ ফেরাতে পারিনি। আমার তীব্র ইচ্ছে হলো ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করি, খুব, খুব : যেন এই মাত্র পাহাড় ফাটিয়ে বেবিয়ে এলো একটা বর্ণনা, সেখানে আমি ছাড়া আর কেউ নেই, আমিই বর্ণনাটাকে দেখছি, সেখানে আমি একবার গা ডোবাবার জন্য ঝাপিয়ে পড়েছিলুম!

চুপ! এরকম কথা বলার আগে তোমার আগ্রহত্যা করা উচিত!

কিন্তু ইচ্ছে যে হয়েছে,, তা তো সত্যি। বাথরুমে দাঁড়িয়ে একলা একলা কি আমি মিথ্যে বলবো নাকি? বাথরুমের আয়নার সামনে অতি পাষণ্ড স্তুতাবাদী হয়।

সত্যের নিকুঠি করেছে! আমি নিজের গালে বেশ জ্যোতি একখানা চড় কষালাম। চুলের মুঠি ধরে টেনে আয়নার দিকে তাকিয়ে বললাম দ্যোথো নলিলোহিত, ফের ওরকম ইচ্ছে-চিচ্ছে হলে তোমার গল্প পিটে খুন করে ফেলেবো! সাতাশ বছর বয়েস হয়ে গেল, নিজে আজ অবধি কোনো প্রেম করতে পারলেন্তি, কাছাকাছি বয়েসের কোনো মেয়ের সঙ্গে ভাব করার মুরোদ নেই! খালি অন্যদের ফাই-ফরমাস খেটে বেড়াও, একটা লাফাঙ্গা

বেকার অপর্দীর্ঘ মুমু তোমাকে কত বিশ্বাস করে, ওর মা-বাবা বিশ্বাস করে, সেই মুমু  
সম্পর্কে তুমি বিশ্বাসঘাতকের মতন...।

শাওয়ার খুলে দিয়ে তার তলায় দাঢ়িলাম।

সকালবেচার জল বেশ ঠাণ্ডা। ঘুম থেকে উঠেই স্বান করার অভ্যেস নেই আমার  
আজ মাথা ঠাণ্ডা হোক। ওরকম অন্যায় চিন্তার ফ্লান্স ধূয়ে যাক।

অন্য কথা ভাবতে হবে। সারা দেশে কত সমস্যা আছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাও,  
নীলজোহিত! সমাজ-কর্মী হও! সংসারে সবাই যবে সারাদিন শত কর্মে রত, তুই শুধু ছিন্ন  
বাধা পলাতক বালকের মত, মধ্যাহ্ন মাঠের মাঝে...।

বাথরুমের দরজায় টকটক শব্দ হচ্ছে।

উত্তর না দিলেও নিষ্ঠার নেই। দাদা গঞ্জির গলায় বললো, আছি নীলু, তুই বাথরুমে  
যে'গ ব্যায়াম করছিস নাকি? তোর জন্য কি অপিস-টফিস ধাবো না?

দাদা এ বাড়ির হিটলার। চাকরি করে বলে সকলের মাথা কিনে রেখেছে।  
বাথরুমের ওপর তার প্রধান দাবি, তার ইচ্ছে হলেই অন্যদের সঙ্গে সঙ্গে বাথরুম ছেড়ে  
দিতে হবে। দাদা কোনোদিন বাজারে যাবে না। ইলেকট্রিকের বিল জমা দেওয়া, গ্যাসের  
দোকানে গিয়ে ধর্মা দেওয়া, রেকর্ড প্লেয়ার সারানো, কেরোসিন জোগাড় করা, এ সব কাজ  
দাদা কোনোদিন পায়ের আঙ্গুল দিয়েও ঝঁঝে দেবে না। রবীন্দ্র সদনে বলশয় ব্যালে এলে  
দাদার জন্য টিকিট কাটতে নীলুকেই সকাল বেলা গিয়ে লাইন দিতে হবে। নীলুটা বেকার,  
তারই তো এসব করার কথা।

যে এত কাজ করে, সেও বেকার হয় কী করে?

মা পর্যন্ত দাদার মেজাজ সমরো চলে।

মাথা ভালো করে না মুছে বেরিয়ে আসতে হলো। দাদার হাতে ইংরিজি খবরের  
কাগজ। বাংলা কাগজটা বিছানায় চা খেতে খেতে বরাদ্দ, ইংরিজি কাগজটা শেষ হবে  
বাথরুমে। অফিস যেতে এখনও দেড় ঘন্টা বাকি!

দাদা বললো, নীলু, তোকে আজ একটা কাজ করতে হবে। আমার ঘরের টেবিলে  
দেখবি একটা ব্রাউন রঙের প্যাকেট রাখা থাকবে। মিঃ ডি এন ধর আজ বিকেলবেলা বস্বে  
থেকে পৌছোবে কলকাতায়। উঠবে তাজ বেঙ্গলে। চিনিস তো হোটেলটা কোথায়? তুই  
সঙ্গেবেলা সেখানে গিয়ে এ প্যাকেটটা তার কাছে পৌছে দিবি। খুব দরকারি কাগজপত্র  
আছে, ওর হাতে দিতে হবে। যদি বস্বে ফ্লাইট লেট থাকে, লবিতে অপেক্ষা করবি। ওর  
হাতে হাতে দেওয়া চাই। বউদির কাছ থেকে ট্রাম ভাড়া চেয়ে নিস।

আমি জিঙ্গেস করলাম, যদি বস্বে ফ্লাইট অনেক লেট থাকে ঠিক কতক্ষণ অপেক্ষা  
করবো?

দাদা এবার দয়া করে একটু হেসে বললো, দা বয় স্টুড অন দা ব্যান্ডেক... পড়িসনি  
কবিতাটা? বস্বে ফ্লাইট এক সময়-না-এক সময় তো আসবেই। মুচি লেট করুক। ডি  
এন ধরও আসবে। সুতরাং যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ ওপ্স্টেট করবি। হোটেলের বাইরে  
বাদাম ভাজা পাওয়া যায়, খোসাওয়ালা বাদাম কিনবি, খোল্স ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে বাদাম খাবি  
আর পায়চারি করবি, দেখবি দিব্যি সময় কেটে যাবে!

এই ধরনের এলেবেলে কথার প্রভাব আমার ঘরে তোকার সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে  
মুছে গেল;

দৃষ্টিভ্রম হলো আমার।

ঠিক যেন এখনও বসে আছে মুমু। আমি খাটে শুয়ে ঘুমিয়ে আছি, সে আমার চোখের ওপর হাত রেখে ঘুম ভাঙচ্ছে। সারা দুনিয়ায় আর কিছু নেই। শুধু আমার চোখের সামনে মুমু তার অবাক অবাক চোখ, স্ফুরিত অধর, কোমল থুতনি, লেসের কাজ করা জায়ায় উত্তল বুক, তার ঝীবার অপরূপ ভঙ্গিমা কেন আমি তার কোমর জড়িয়ে ধরে আদর করিনি

এখনই ছুটে চলে যাবো মুমুর কাছে? তাকে বুকে চেপে ধরে বলবো, মুমু, তুমি আমার, তুমি আমি কারূর নও!

হায়, এ কী হলো আমার? ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। বুড়ো বয়েসে লোকের ভীমরতি হয়, এর মধ্যেই আমার এখন অধঃপতন! মুমু সম্পর্কে অন্যায় চিন্তা! কিংবা, সত্যি সত্যি প্রেমেই পড়ে গেলাম নাকি? যে প্রেম যুক্তি মানে না?

না, না, না, এসব চলবে না। পালাতে হবে, পালাতে হবে। মুমুর সামনে কোনো রকম দুর্বলতা প্রকাশ করা তো দূরের কথা, ওর সঙ্গে এখন কিছুদিন দেখা না করাই ভালো। বেশ কিছুদিন চোখের আড়াল হলেই এই রোগ স্থুচে যাবে। পালাও পালাও, নীললোহিত। চলো মন, দিকশ্ন্যপুর!

## ॥ ২ ॥

বউদির কাছ থেকে ঠিক এই সোমবারই পঞ্চশ টাকা ধার নিয়েছি, এক্ষুনি আর চাওয়া যায় না। আমার বেশি দরকার নেই, পঞ্চশ-ষাট টাকা হলেই চলবে; বাড়ির বাজার খরচ থেকে বড় জোর চার-পাঁচ টাকা ম্যানেজ করা যায়। সব জিনিসপত্রেই যা দাম এখন! বাড়িতে এসে বাড়িয়ে বলবো কী। যতটা বাড়িয়ে বললে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়, আসল দাম তার চেয়েও বেশি!

ত্রেন ভাড়াটা জোগাড় করতে পারলেই হয়। তারপর দিকশ্ন্যপুর পৌছে গেলে আর টাকাপয়সা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না, পকেটে টাকা রাখার দরকারই হয় না। সেখানে গিয়েই বন্দনাদির আলুখেতে কাজে লেগে যাবো কিংবা ছিপ ফেলে বসে থাকবো নদীতে, একটা মাঝারি সাইজের মাছ ধরতে পারলেই যে-কোনো বাড়িতে আমাকে আদর করে ভাত খেতে দেবে। ওখানকার নদীতে অনেক কাতলা মাছ। এক একদিন দল বেঁধে জঙ্গলে যাওয়া হবে পাথুরে-নুন খুঁজতে, প্রত্যেক দিন সদের পর ক্যাম্প ফায়ার। মুক্ত চতুরের মাঝখানে চেলা কাটে আগুন জ্বালা হবে, সেই আগুন ঘিরে গোল হয়ে বসে, কেউ গান শোনাবে, কেউ পড়বে একটা কবিতা, কিংবা মজার গল্পে হাসির তরঙ্গ উঠবে বাতাসে।

টাকাটা কোথা থেকে জোটানো যায়?

প্রীতম এখন ফ্রি-লাস ফটোগ্রাফার হিসেবে খুব নাম করেছে, ট্যাক্সি-ক্লাউড কোথাও এক পা যায় না। কিন্তু প্রীতমটা বড় চালিয়াৎ হয়ে গেছে। টাকার কথা তুলনেই কেন লাগবে, কোথায় যাবি, আয় তোকে একটা কাজ জুটিয়ে দিচ্ছি এবং থেকে অনেক বেশি টাকা রোজগার করতে পারবি, এইসব আজেবাজে কথা শুন করবে!

কোনো রেস্টোরায় নিয়ে গিয়ে বিয়ার ও ভালো ভালো খুবুর খাইয়ে অন্যায়ে আড়াই শো-তিন শো টাকা খরচ করে ফেলবে প্রীতম, কিন্তু মাঝে পঞ্চশাট। টাকা ধার চাইলেই শুরু করবে ধানাই-পানাই। বিচিত্র মানুষের চরিত্র!

চন্দনদা-তপনদার মতন দাদা স্থানীয়দের কাছে এখন ধার চাইতে গেলেই ওরা ঠাট্টা-ইয়ার্কি শুরু করে। তপনদা বলে, তুই ডিকশনারি থেকে ধার কথাটার মানে পাল্টে দে, নীলু!

ওঁদের কাছে আর যাওয়া যায় না ।

একমাত্র একজন আছে, লালুদা, তার কাছে মুখ খোলা মাত্র এক তাড়া-নোট বার করে তার থেকে দু'খানা পঞ্চাশ টাকার নোট তুলে দেবে, সঙ্গে সেই ই-য-ব-র-ল'র বেড়ালটার মতো হাসি । নাঃ, লালুদার কাছে আমার কিছু দরকার নেই । ওকে সাবধান করে দিতে হবে, ও যেন আর কফনে মুমুর কাঁধে হাত দিয়ে মেহ না দেখায় ।

মানস নতুন চাকরি পেয়েছে, ওর কাছে যাওয়া যেতে পারে ।

ঠিক নতুন চাকরি নয়, মানস আগে একটা কাজ করত আসানসোলে, সেটা ছেড়ে দিয়ে আর এটা চাকরি পেয়ে চলে এসেছে কলকাতায়, এতে মাইনে বেশি । মানস এখনও বিয়ে করেনি । এইসব ছেলেরা টাকা জমায় ।

ইঙ্কুলে পড়ার সময় মানস তার আমি একদিন কাকদ্বীপ বেড়াতে গিয়েছিলাম । সেদিন ইঙ্কুলে গিয়ে দেখি, হঠাৎ স্ট্রাইক । বাড়ি না ফিরে আমি মানসকে বলেছিলাম, চল, কোনো একটা জায়গা থেকে ঘুরে আসি ।

ইঙ্কুলের ছেলের পক্ষে কাকদ্বীপ বেশ দূরই বলতে হবে । আমরা শিয়ালদা থেকে ট্রেনে চেপে গেছি ডায়মণ্ড হারবার, তারপর বাসে চেপে কাকদ্বীপ । সেখানকার গঙ্গা প্রায় সমুদ্রের মতন চওড়া । এক রকম ছোট ছোট মাছ কাদার ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে ওপরে চলে আসে, সেটা দেখাও এক নতুন অভিজ্ঞতা ।

আমি বরাবরই বার-মুখো, এর আগেও ইঙ্কুল পালিয়ে টো-টো করে ঘুরেছি, কিন্তু কোনো অভিভাবকের সঙ্গ ছাড়া মানসের সেই প্রথম ভ্রমণ-অভিযান । মানস এখন প্রতি বছর ছুটি নিয়ে পাহাড়ে যায়, ঝুপকুণ্ড পর্যন্ত ট্রেকিং করেছে । কিন্তু আমি যে মানসকে প্রথম দীক্ষা দিয়েছি, সে কথা ও প্রায়ই বলে ।

অফিসের কাজের সময় বিম্ব ঘটানো উচিত নয়, টিফিনের সময় দেখা করতে যাওয়াই সঙ্গত ।

টিফেন হাউজে মানসের অফিস, তার গেটের কাছেই ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল । দাকুণ একটা ঝুকমকে শার্ট পরেছে মানস, নিশ্চিত বিদেশি । মানসের দিদি ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকে, প্রায়ই নানারকম জিনিসপত্র পাঠায় ।

মানস বললো, চল নীলু, তোকে আমি আজ আফগানি কাটলেট খাওয়াবো ।

বি-বা-দী বাগের মতন এমন একটা চমৎকার নাম দেওয়া হয়েছে, তবু ডালহাউসি ক্ষোয়ার নামটাকে এখনও তাড়ানো যাচ্ছে না ট্রাম-বাসের লোকরা এখনও অফিস পাড়া বলতেই বোঝায় ডালহাউসি ।

এই বি-বা-দী বাগে যে কত রকম খাবারের দোকান, তা এইরকম দুপুরে টিফিনের সময় না এলে বোঝা যায় না । পাকা পেঁপে-কলা থেকে শুরু করে বিরিয়ানি গুঁড়োমিন পর্যন্ত ফুটপাতে দাঁড়িয়েই দাঁড়িয়েই খাওয়া যায় । ফুটপাথে বেঞ্চ পেতে বসাওয়া ব্যবস্থা আছে, সেখানে কেউ লুচি-আলুর দম, কেউ খিচুড়ি-মাছ ভাজা খাচ্ছে । এস্বৰ্গী রয়েছে অলিতে-গলিতে অজস্র ছোটখাটো রেস্তোরাঁ । যারা এ পাড়ায় চাকরি পরে না, তারা এইসব রেস্তোরাঁর সন্ধানও রাখে না । এর বেশির ভাগই সঙ্গের পর বস্ক হয়ে যায় ।

মানস জুনিয়ার ছেড়ের অফিসার, সে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বা বসে খাবে না । সে আমাকে নিয়ে এলো হাইকোর্টের কাছাকাছি এক গুলির মধ্যে রেস্তোরাঁয় । সে রকম একটা কিছু ঝুকবকে পরিষ্কৃত কিংবা উচ্চাসের ক্ষেত্রে ছোটখাটো, তবু এর দোতলা আছে । কাঠের নড়বড়ে সিঁড়ি দিয়ে আমরা উঠে এলাই দোতলায়, এখানে দুটি মাত্র টেবিল, কোণের টেবিলটায় বসলে নিচের লোকজন এবং রাস্তা পর্যন্ত দেখ্য যায় ।

মানস বসলো, তুই আজ এসেছিস, নীল, খুব ভালো হয়েছে। নতুন অফিসে কারণের সঙ্গে আমার এখনও তেমন ঘনিষ্ঠতা হয়নি, টিফিনের সময় একলা বেরোই, কিন্তু কোনো রেস্তোরাঁয় একলা বসে থেকে কেমন যেন বোকা বোকা লাগে। এই দোকানটায় তো একা আসার প্রশ্নই ওঠে না।

— কেন, এখানে একা আসা যায় না কেন?

— তার একটা কারণ আছে। পরে বলবো। তুই আফগান কাটলেটের সঙ্গে টোস্ট খাবি? মোগলাই পরোটাও নিতে পারিস।

— একই সঙ্গে আফগান আর মোগলাই আমার চলবে না ভাই। টোস্টও চাই না। এমন কি কাটলেটটাও না খেলে পারি। তোর খিদে পেয়েছে, তুই খা, আমার এক কাপ চা-ই যথেষ্ট।

— এই কাটলেটটা খেয়ে দ্যাখ, দারুণ বানায়। মেনুটা দ্যাখ, তোর আর যা খুশি হয় অর্ডার দিতে পারিস, আমার কাছে আজ টাকা আছে।

এরপর মানস অফিসের গল্প শুরু করলো।

আমি আধ-শোনা অবস্থায় শুধু ভাবতে লাগলুম, আমাকে টাকাটা দেবে? না, দেবে-না! মানসও যদি প্রতীমের মতন রেস্তোরাঁয় ম্যানেজারদের মুঞ্চ করার জন্য এক গাদা খাবারের বিল দেয় কিন্তু বন্ধুকে টাকা ধার দিতে দিখা করে, কিংবা জেরা করেং?

মানস জানে না, ওর জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আজ আমার ওপর নির্ভর করছে। টাকাটা ধার দেবার ব্যাপারে মানস যদি একটুও ইতস্তত করে, তা হলেও ওর এক বাল্যবন্ধুকে চিরকালের মতন হারাবে। নীললোহিত আর কখনও ওর পয়সায় কাটলেট খেতে আসবে না, কোনোদিন দেখাই করবে না। বন্ধুকে যে অসময়ে টাকা ধার দেয় না, সে আবার বন্ধু কিসের! আমার অন্তরঙ্গদের তালিকা থেকে মানসের নাম কেটে দেবো!

ধারের ব্যাপারে সবচেয়ে কঠিন অংশ হচ্ছে কথাটা উচ্চারণ করা।

ঠিক কোন সময়ে বলবো? একটা লোক অফিসের সহকর্মীরা যে কী রকম মানুষ, এইসব গল্প করছে, হঠাৎ থামিয়ে দিয়ে টাকার কথা বলা যায়?

মানস হঠাৎ চুপ করে গিয়ে নিচের টেবিলগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো। এর মধ্যে ভর্তি হয়ে গেছে সব টেবিল। পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যাও কম নয়। মেয়েরা দল বেঁধে বেঁধে আলাদা। বসে, দরজার কাছেই একটা টেবিলে বসেছে চারটে যুবতী, মানস তাদের দিকেই চেয়ে আছে এক দৃষ্টিতে।

বেচারা এই সময় একটু মনের সুখে মেয়ে দেখছে, এর মধ্যে কি ওর ঘোর ভাঙ্গিয়ে কেউ বলতে পারে, আমায় কিছু টাকা ধার দে!

মহা মুশকিল! জীবনের অনেক ব্যাপারেই ঠিক ঠিক মুহূর্তটা ধরতে না পারলেই অনেক কিছু ভুল হয়ে যায়।

মুখ ফিরিয়ে বেশ গাঢ় গলায় মানস বললো, তুই স্মার্জিত এলি, নীল, তাতে যে আমার কী আনন্দ হচ্ছে, তোকে কী করে বোঝাবো! এ ম্যান টেলিপ্যাথি! ক'দিন ধরে আমি তোর কথাই ভাবছিলাম। তুই আমার একটা উপর্যুক্ত করবি?

— কেন করবো না! যদি সম্ভব হয়।

— তুই-ই পারবি এটা! তুই বোধ হয়জানিস না, আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমি বাবা-মায়ের সম্বন্ধ করা বিয়ে করবো না কোনোদিন। কিছুতেই না।

কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া কিংবা মেয়েকে গেথে দেখে বেড়ানো, ওসব আমার দ্বারা হবে না। যদি কখনও কোনো মেয়েকে আমার ভালো লাগে, আমার মনে হয়, সে আমার জীবন সঙ্গনী হতে পারবে, এবং আমাকেও যদি সে পছন্দ করে, তা হলেই বিয়ে করার প্রশ্ন আসবে। না হলে বিয়েই করবো না!

— এ তো খুবই অনারেব্ল ব্যাপার। সে রকম কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম-ট্রেম হয়েছে?

— আগে সবটা শোন। আমার মায়ের বয়েস হয়েছে, শরীরও ভালো না। মা এখন আমার বিয়ের জন্য খুব পিড়াগীড়ি শুরু করেছেন। আমার ছোট বোনটার বিয়ে হয়ে গেছে, মা এখন আমার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। কানুকাটি করেন পর্যন্ত।

— কানুর অংশটা বাদ দিলেও তোর বিয়ের জন্য তোর বাড়ির লোক ব্যস্ত হয়ে উঠবে, এ তো স্বাভাবিক। তুই জীবনে প্রতিষ্ঠিত, ভালো চাকরি, কলকাতায় পোষ্টিং, বাণিজিক ছেলেরা এই রকম অবস্থাতেই তো টপাটপ বিয়ে করে ফেলে। ছেলেরা বিয়ে না করলে মেয়েদেরও বিয়ে হয় না। মেয়েদের বিয়ে না হলে বেনারসী শাড়ি বিক্রি বদ্ধ। তাঁতিদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে যাবে।

— তুই অন্য দিকে কথা নিয়ে যাচ্ছিস, নীলু?

— তুই তোর বাড়ির লোকদের বলেছিস যে তুই প্রেম না করে বিয়ে করবি না?

— আমি মোটেই তোকে প্রেমের কথা বলিনি। বলেছি পছন্দের কথা। প্রেম মানে কী? এটা মেয়ের সঙ্গে হ্যা-হ্যা করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো, কিংবা সঙ্গেবেলা গঙ্গার ধারে বসে গুজুর-গুজুর ফুসুর-ফুসুর করা? ওসব আমার দ্বারা হবে না!

— কারুকে পছন্দ হয়েছে?

— তুই এদিকে দ্যাখ, নিচে দরজার কাছে টেবিলে যে কয়েকটি মেয়ে বসে আছে, আহা, অত ঝুঁকিস না, প্যাট-প্যাট করে তাকাস না, কোনাচে করে দেখে নে, ডান দিকে কচি কলাপাতা শাড়ি পরে যে মেয়েটি বসে আছে, কোমরে সাদা কুমাল গোঁজা, একটু একটু সর্দি হয়েছে, চুল খোলা, ওকে তোর কেমন মনে হয়?

— বাঃ, বেশ দেখতে। কিছু তুই এতদূর থেকে কী করে বুঝলি রে, মানস, যে ওর একটু একটু সর্দি হয়েছে?

— মাঝে মাঝে নাকে কুমালটা হেঁয়াচ্ছে দেখছিস না? তার মানে এই কুমালে ইউক্যালিপটাস মাখানো আছে।

— মেয়েটি বুঝি এই রেন্টোরায় প্রায়ই আসে?

— সপ্তাহে অন্তত তিন দিন। সেই জন্যই তো আমি এখানে একা আসতে পারি না। ঘন ঘন এলে, যদি আমাকে দেখতে পায়, ভাববে ওকে ফলো করছি।

— ওর সঙ্গে তোর আলাপ হয়েছে?

— হয়নি। আবার হয়েছেও বলতে পারিস। আমাদের বিন্দি<sup>১</sup> এই দুটো ফ্রোর ওপরে ওদের অফিস। লিফটে দেখা হয়। ওর বেশ একটা ডিগনিজি অফিস। কোনো ছেলেটেলের সঙ্গে ঢলালি করে না। মার্জিত, ভদ্র ব্যবহার। হাঁটার ভঙ্গি দেখলেই বোৰা যায়, অন্য আর পাঁচজনের মতন না। রোজই তো একসঙ্গে লিফ্টট উঠি, মুখচেনা হয়ে গেছে, চোখাচোরি হলে ও একটু হাসে, আমিও একটু হাসি<sup>২</sup> ব্যস, এই পর্যন্ত।

— একটা কথা হয়নি?

— প্রথম কথাটা কে বলবে, ও না আমি?

— তুই পুরুষ মানুষ, তুই-ই বলবি!

— কী কথা বলবো? একটা কিছু দিয়ে শুরু করতে হয় তো। ঠিক কোম কথাটা দিয়ে আলাপ শুরু করব, সেটা আমি ভেবেই পাই না। কী বলা যায় বল তো?

— আমি কি প্রেমের ব্যাপারে এক্সপার্ট নাকি? আমি কী করে জানবো? এক কাজ কর, যেয়েদের ম্যাগাজিন পড়। আজকাল অনেক যেয়েদের ম্যাগাজিনে এইসব ব্যাপারে পরামর্শ থাকে।

— ধ্যাং! তবে একটা ব্যাপার হয়, জানিস, শুধু তোকেই বলছি। লিফটে ওঠানামার সময় ওর কাছাকাছি দাঁড়ালেই আমার বুকের মধ্যে দুপ দুপ দুপ দুপ এইরকম আওয়াজ হতে থাকে। আরও কত মেয়ে তো লিফটে ওঠে। অফিস পাড়ায় আরও কত মেয়েকে দেখি, কই অন্য কারুকে দেখলে তো ঐ আওয়াজটা হয় না বুকে! টেই কি প্রেমের একটা লক্ষণ?

— হতেই পারে। তুই যে লক্ষ করেছিস যেয়েটির পাতলা সর্দি হয়েছে, সেটা ও প্রেম। ব্যাপারটা তো বুবলাম। এরপর ইংরিজি করে জিজ্ঞেস করতে হয়। আমি এই ছবির মধ্যে কী করি আসছি?

— তোকে একটা গরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে। একদিন ও অল্য একটি যেয়ের সঙ্গে কথা বলছিল, আমি ওভার-হিয়ার করে জেনেছি, ও চন্দননগরে থাকে। গোজ টেনে যাওয়া-আসা করে। তই আজ টেনে করে চন্দননগর চলে যা ওর সঙ্গে। আমি যেতে পারব না, আমাকে চিনে ফেলবে, আমার সম্পর্কে একটা খারাপ ধারণা করে ফেলতে পারে। তোকে তো চিনবে না। তুই ক্ষেপণ থেকে একটা সাইকেল রিঞ্চা নিবি একটি খবরের কাগজ পড়ার ভান করে ফলো করবি ওর রিঞ্চা। ওর বাড়িটা দেখে আসবি,

— বাড়ি দেখে এসে কী হবে?

— চন্দননগরে অনেক বিশাল বিশাল বাড়ি আছে। যদি দেখিস দেরকম কোনো বাড়ির মেয়ে, তা হলে কোনো আশা নেই। আমরা তাই সাধারণ মধ্যবিত্ত। আর যদি দেখিস, খুব হোট বাড়ি, এক গান্দা লোক, ওর অনেকগুলো ভাই-বোন, তা হলেও আর এগোব না। শুশুর্বাড়ির বেশি লোকজন আমার একেবারে পচ্চন নয়।

— যেয়েটির ক'টা ভাইবেন, সেটা কী করে বুকবে: বল তো?

— পাড়ার লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করবি। আমি, তুই ঠিক আছে, সেটা যদি না পারিস, শুধু বাড়িটা দেখে আসবি বাড়ির নম্বরটা লেটি করবি তাতেই হবে। তুই এটুকু করতে পারবি নি আমার জন্য!

— তা পারব না কেন? এমন তো শক্ত কিছু নয়।

এই কথা বল্লার পরেই যেন আমারে মাথায় বজালাগত হলো।

সর্বনাশ! এরপর আর আমি টাকা নাব চাইবো কী করে? এখন ঘাউ টাকা দেবার কথা বললেই মানস ভাববে, আমি ওর এই কাজটা করে দেবার জন্য ফি চাইছি। প্রকল্প বন্ধুর জন্য এই সামান্য উপকার করার পর কেউ খাটি দেবে। চাইতে পারে? দশমুখোর হাড়া!

ঠিক ঠিক মুহূর্তটা আমি ধরতে পারিনি, এর পর আর টাকা পার্বার কেমন আশা নেই।

মানস বললে, তুই বাড়িটা দেখে এলে আমি আমার নেই মামাকে বোঝবাব নিতে বলব। মামারা ওদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করবে, বিয়ের প্রক্রিয়া দেবে, ভারপর যা হয় হবে।

আমি বললাম, অর্থাৎ সম্বক্ষ করা বিয়ে, মাইক্রো যেয়ে দেখা। তোর মামা-টামারা আর ঐ যেয়েটির বাড়ির লোক কথাবার্তা বলে যেয়ের ব্যাপারটি সব ঠিক করবে। তুই শুধু যেয়ে-পছন্দ করার ব্যাপারটা আগেই সেবে ফেলেচ্স!

— ঠিক তাই। মায়েদেরও খুশি করা হলো। আমারও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা হবে।

— বাঃ! আইডিয়াল...

— তুই তা হলে আজই...

কথা থামিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে রইলো মানস।

দূরজার সামনের টেবিলের চারটি মেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। কটি কলাপাতা রঙের শাড়ি  
পরা মেয়েটির নাকের কাছে সাদা ঝুমাল। সবাই কী একটা হাসির কথায় দুলছে।

মানস বলল, দ্যাখ, দ্যাখ, কী ভাবে হাঁটছে, অন্য সবাইয়ের থেকে আলাদা!

সে রকম কোনো বৈশিষ্ট্য আমার চোখে ধরা পড়ল না। প্রেমিকই একমাত্র এসব  
দেখতে পায়।

মানস বলল, ওর নাম শ্ৰেয়া। শ্ৰেয়া দত্ত। নামটা সার্থক কী না বল! তুই আজই চলে  
যা নীলু। দেরি করে লাভ কী? তোকে পাঁচটা পর্যন্ত সময় কাটাতে হবে। তুই কোথা  
থেকে ঘুৱে আসবি? কিংবা ইচ্ছে করলে আমাদের অফিসেও গিয়ে বসতে পারিস।  
ম্যাগাজিন-ট্যাগার্জিন আছে কিছু, সেগুলো দেখবি।

ঠিক আছে, বলতে গিয়েও আমি থেমে গেলাম।

যাঃ, খুব ভুল হয়ে যাচ্ছিল আর একটু হলে। আজ যাব কী করে!

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, এই রে, আজ তো সষ্ঠি হচ্ছে না! আজ সকেবেলা যে তাজ  
বেঙ্গল হোটেল যেতে হবে আমাকে।

চোখ সরু করে আমার দিকে তাকালো মানস।

গলায় অবিশ্বাসের চিবুনি দিয়ে বলল, তুই বুঝি আজকাল সঙ্গেগুলো তাজ বেঙ্গলে  
কাটাতে শুরু করেছিস?

আমি হাসলাম। আসল কারণটা না জানলে আমার কথাটা চালিয়াতের ঘতনই  
শোনায় বটে।

দাদা আমাকে একটা কাজের ভার দিয়েছে, ভাগিয়স সেটা মনে পড়ে গেল। দাদার  
আদেশ লঙ্ঘন করার সাথে নেই। একজন অচেনা লোকের কাছে একটা প্যাকেট পৌছে  
দিতে হবে। দাদার অফিসে যে-কোনো বেয়াবাই এ কাগজটা করতে পারত। তবু দাদা  
আমাকেই যেতে বাধ্য করছে। দাদা কি আজকাল শ্বাগলিং-টাগলিং শুরু করেছে নাকি?

মানসের কাছে খানিকটা ঋহস্য রেখে দিয়ে বললাম, সত্যি রে, আজ আমাকে  
একবার ওখানে যেতেই হবে।

— কাল? কালকেও?

— না, না, কাল ফি আছি।

— তা হলে কাল চলে আয়। সাড়ে চারটে-পেন্নে পাঁচটার মধ্যেও শ্ৰেয়া ঠিক  
পাঁচটার সময় অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ে। কথা দিচ্ছিস?

— হ্যা, কাল ঠিক আসব।

রেন্ডেরাঁ ছেড়ে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়।

মানসকে এক্সুনি ফিরতে হবে অফিসে। বেশ খানিকটা সুরে একটা পানের দোকানের  
সামনে দাঁড়িয়ে আছে শ্ৰেয়া ও অন্য তিনটি মেয়ে।

সেদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘস্থান ফেলে মানস বলল, আমি ওদের সামনে দিয়ে  
যেতে চাই না, উল্টো দিক দিয়ে যাচ্ছি।

সেখানেই আমি ওর কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

আফগান কাটলেটিটি একেবারে অখাদ্য। কিমার সঙ্গে আলু চটকে বিস্কুটের ঝঁড়ে দিয়ে একটা ঢাটস জিনিস বানিয়েছে। কাটলেট না ছাই! প্লেট ভর্তি করে সাজিয়ে দেয়।

মুখটা বিস্বাদ হয়ে গেছে। না, শুধু ঐ কাটলেটের জন্যই নয়।

এ যে ফাঁদে পড়ে গেলাম! মানসের কাছ থেকে টাকা পাবার আর আশা নেই। আজই দিকশূন্যপুরে পালাব ভেবেছিলাম। প্রথমে আটকে দিল দাদা। বব্বে থেকে ডি এন ধর নামে একজন লোক আসবে, তাকে ধরতে হবে। তারপর কালও যাওয়া যাবে না, মানসকে কথা দিয়ে ফেলতে হল।

আমি মুমুদের বাড়িতে যে-কোনো সময় যেতে পারি। মুমুর পড়ার ঘরে বসে নিভৃতে গল্প করতে পারি। ওকে আইসক্রিম খাওয়াবার জন্য নিয়ে যেতে পারি যে-কোনো রেস্তোরাঁয়। সেজন্য ওর বাবা-মায়ের কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে না। তবু আমি মুমুর কাছ থেকে পালাতে চাইছি। অথচ, অন্য একজনের প্রেমিকাকে অনুসরণ করে যেতে হবে চন্দননগর। এটা একটা উদ্ভুত ব্যাপার না? প্রেমিকাই বা কোথায়, ঐ মেয়েটির সঙ্গে মানসের এখনও পর্যন্ত একটাও কথা হয়নি!

মানসটা আসলে বিয়ে-পাগলা হয়ে গেছে। মায়ের অসুখ-টসুখ ওসব সবাই বলে, একটা সময় সবাই নিজের ইচ্ছেটাকেই মা-বাবার নামে চালিয়ে দেয়। তা করুক না ও বিয়ে! তার জন্য আমাকে একটা প্রাইভেট-ডিটেকটিভের মতন একটি মেয়েকে ফলো করতে হবে কেন? মাত্র ষাটটা টাকাও আমাকে কেউ দেবে না?

আপাতত তাজ-বেঙ্গলে যাওয়ার চিন্তা আমার মাথায় ঘূরতে লাগল।

তাজ বেঙ্গল হোটেলে কি আমাকে ইংরিজিতে কথা বলতে হবে!

বড় বড় হোটেলে সবাই ইংরিজিতে কথা বলে। কেন রে বাবা, এটা কি বিলেত নাকি? যতই সুট-বুট পরিস, টাই ঝোলাস আর বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে ইংরিজি বলিস, তোদের কেউ কোনোদিন সাহেব বলবে? অভারতীয় পোশাক-টোশাকে বেশি বেশি সাহেব সাজার চেষ্টা করলে তাদের দেখায় মর্কটের মতন!

ফ্রান্সের কোনো হোটেলে চুকে ফরাসি ভাষায় কথা বললে কাউটারের লোকটি বুঝবে না, এ কখনও হতে পারে? রোমের কোনে: হোটেলের কর্মচারি যদি বলে আমি ইতালিয়ান ভাষা বুঝি না, তা হলে তাকে তক্ষুনি বিদায় করে দেবে না? অথচ ফরাসি কিংবা ইতালিয়ান ভাষার চেয়ে বাংলা কিংবা হিন্দিভাষীর সংখ্যা অনেক বেশি। আমি অনেক জায়গায় পড়েছি, পৃথিবীর প্রধান সাতটি ভাষার মধ্যে হিন্দি আর বাংলা দুটোরই স্থান আছে, ফরাসি-ইতালিয়ানের স্থান অনেক নিচে। তা হলে কেন কলকাতার হোটেলে বাংলা বলা চলবে নাও?

ফরাসি-ইতালিয়ানরা নিজেদের ভাষা নিয়ে গর্বিত। আর আমরা আমাদের বাংলা ভাষা নিয়ে লজ্জিত? রবীন্দ্রনাথ সারা পৃথিবীতে বাংলা ভাষার সম্মান প্রতিষ্ঠা করে গেলেন, সেই সম্মান আমরা ধৰ্ম করে দিচ্ছি। আজ পশ্চিমবাংলার একজন সাধারণ মানুষ ব্যাক্সে কিংবা পোস্ট অফিসে গিয়ে এটা আবেদনপত্র ভর্তি করতে পারবে না, তাকে বাংলা ভাষার কোনো স্থান নেই। স্বাধীন ভারতে রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে কী কষ্ট করে মানুষ পেতেন!

ঠিক সাড়ে ছ'টায় তাজ বেঙ্গলের গেটের সামনে উপস্থিত হলাম।

মেজাজটা এখন আরও খারাপ হয়ে গেছে।

মাঝাধানের সময়টা কাটাবার জন্য নদনে চুকে বসে ছিলাম একটা সিনেমা দেখার জন্য। অল্প পয়সায় তবু ঠাণ্ডায় বসে থাকা যায়। কিন্তু এমন একটা বিকট সিনেমা দেখাল

মুণ্ডুর না গদার কার যেন, তার মাথামুণ্ডু কিছুই বোজা যায় না, সেটা শেষ হতেই দর্শকরা সবাই মিলে কী আহা-উহ প্রশংসা করতে লাগল! আমি কিছু বুঝলাম না। আর বাকি লোকরা সব বুঝে গেল? গদার, গদার, এই লোকটাই বলেছিল না যে সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালি বসে দেখা যায় না? এ তো নিজে ছবি তোলে ভওদের জন্য। ভাগিয়স সত্যজিৎ রায় এইসব আজেবাজে লোকের কথায় কান দেননি!

—তাজ বেঙ্গলের গেটে দাঁড়িয়ে ঠিক করলাম, এটা অক্ষর ইংরিজি উচ্চারণ করব না। যদি আমার বাংলা বুঝতে না পারে, তা হলে বলব, যাও, উল্টো দিকের চিঢ়িয়াখানায় বাঁদরের ঝাঁচা খালি আছে।

আমি গাড়ি থেকেও নামিনি, সুট-টাই পরিও আসিনি। কেঁচানো ধূতি ও দামি পাঞ্জাবিরও কিছুটা কদর আছে, কিন্তু আমার অঙ্গে সাধারণ পাজামা-পাঞ্জাবি, চটির অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়। যে বিশাল চেহারার দারোয়ানটি অন্যদের গাড়ির দরজা খুলে দেয় ও লম্বা সেলাম করে, সে আমার দিকে বক্রভাবে তাকাল, কিন্তু বাধা দিল না।

তেতুরের বিশাল লাউঞ্জে আমার প্রথমটায় একটু দিশেহারা অবস্থা হল।

এর আগে এখানে কথনও আসিনি, পরে আর কথনও আসবও না। আমার ভয়ের কী আছে? আমাকে কেউ অপমান করতে চাইলে আমি চিন্কার করে বলব, খবরদার! এটা কলকাতা শহর, এটা রবীনুনাথের শহর! বিদেশিরা ইংরিজি বলে বলুক, এদেশীয়দের বাংলা ভাষাকে সম্মান জানাতেই হবে!

এদিক-ওদিকে বিভিন্ন রকমের কাউন্টার। এক জায়গায় একটি যুবক একলা দাঁড়িয়ে আছে, অন্য জায়গায় বেশ ভিড়।

তার দিকেই এগিয়ে গিয়ে অতি নম্বু ব্রহ্মের বললাম, নমস্কার। একটি কথা জিজ্ঞেস করতে পারিঃ

যুবকটি বলল, ইয়েস, ইউ আর ওয়েলকাম

আমি আবার বললাম, শ্রীযুক্ত দুর্নামে এক ভদ্রলোকের বাস থেকে আসবার কথা আছে। তিনি এখানেই উঠবেন। তিনি এসেছেন কী? যদি এসে থাকেন, তা হলে তাঁর ঘরের নম্বর কত?

সংখ্যার বদলে আমি নম্বরই বললাম। ওটাও বাংলাই হয়ে গেছে।

যুবকটি ভুক্ত কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, হোয়াটস্ দা নেইম ইউ সেইড?

আমি বললাম, তাঁর পদবী ধর। প্রথম নামটা ঠিক জানি না।

— ওয়ান মোমেন্ট প্রিজ!

\* সে তেতুরের দিকে খোজখবর নিতে চলে গেল। ও যত ইচ্ছে ইংরিজি বলুক, আমার বাংলা শুনে বুঝতে পারলেই হল। যদি বলত, তোমার কথা বুবাক্তে প্রাপ্ত না, তা হলে আমিও বলতাম, যে বুঝবে তেমন লোককে ডাকো।

একটু পরে যুবকটি ফিরে এসে ভাঙা বাংলাতে বলল, হ্যা, মিস্ট্রি বৰ্বেরের এখানে বুকিং আছে। এখনও এসে পৌছোননি। তবে বাস ফ্লাইট দমদমে একটুমাত্র ল্যান্ড করেছে। এই ফ্লাইটেই প্যাসেঞ্জারো খানিক বাদে এসে যাবেন।

বাঃ, এ তো বেশ বাংলা বলে! নিচয়ই আমাকে দেখে বুঝেছে, পেটে বোমা মারলেও আমার মুখ দিয়ে ইংরিজি বেকবে না। ইংরিজি যে জানেই না, সে বলবে কী করে?

আমি একমুখ হেসে বললাম, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

সে বেশ বিনীতভাবে বলল, আপনি বসুন না! একটু অপেক্ষা করুন।

— কোথায় বসব?

— যে কোনো জায়গায়। এ তো হোটেল, সবটাই আপনাদের জন্য!

বাঃ, কথাটা শুনতে বেশ ভাল। কিন্তু সবার মানে যাদের অনেক পয়সা আছে তাদের জন্য। আমার মতন এলেবেলেদের জন্য নয়।

সারা লাউঞ্জ জুড়ে অনেক মোটকা মোটকা সোফা ছড়ানো। নানা রকমের রং। তারই একটায় গিয়ে গাঁট হয়ে বসে পড়লাম; যুবকটি আমাকে অভয় দ্রু়েছে। সম্ভবত ও আমারই বয়েসী হবে।

বসে বসে বিভিন্ন যাত্রীদের গতিবিধি লক্ষ্য করলে বেশ সময় কেটে যায়। কিছু কিছু সাহেব-মেম আছে। শ্বেতাঙ্গ ভ্রমণকারীরা কলকাতাকে নেকনজরে দেখে না কলকাতায় ইতিহাস নেই, আমোদ-প্রমোদও তেমন নেই, আবর্জনার স্তুপ আর ভিখিরিঙ্গাই বাইরের লোকের চোখে পড়ে। এই যারা তবু এসেছে, এদের নিশ্চয়ই ব্যবসার কাজকর্ম আছে। কিংবা, শুনেছি, নেপালে বেড়াতে যাবার জন্য কেউ কেউ এক রাত কলকাতায় কাটিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

এদেশীয়দের মধ্যে বাঙালি প্রায় নেই-ই বলতে গেলে। বাঙালির পয়সা কোথায় এত বড়? হোটেলে এসে ওড়াবার মতন? বাঙালির সব পয়সা অন্যরা চুম্ব নিয়েছে। কিংবা একককালের ধৰ্মী বাঙালিদের অধ্যন পুরুষ বোকার মতন নিজেদের ব্যবসাট্যবসা নষ্ট করে ফেলেছে, বড় বড় বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে গা-ঢাকা দিচ্ছে মফস্বলে।

অল্প বয়েসী মাড়োয়াড়ি ছেলেমেয়েরাই এখানে ঘুরছে বেশি। তারা এখানে এমনভাবে হাঁটা-চলা করছে, যেন এই হোটেলের মালিক তারাই। তারা চেঁচিয়ে কথা বলে, কাউন্টারে গিয়ে হিন্দি বলতে দ্বিধা করে না, ওদের পকেটে বনবন করছে টাকা। ওরা যা খুশি করতে পারে।

এই স্বকিছুর মাঝখানে আমি বসে আছি এক কাঠ বেকার। কিন্তু প্রথম আমাকে যে ইন্দ্রিয়তা পেয়ে বসেছিল, এখন সেটা কেটে গেছে। এই হোটেলে এক কাপ চা খাওয়ার সামর্থ্য আমার নেই, কিন্তু এখানকার অ্যাশট্রেতে সিগারেটের টুকরো ফেলার অধিকার আমার আছে।

এক সময়ে দেখি, কাউন্টারে সেই ছেলেটি আমাকে ডাকছে হাতছানি দিয়ে। এই রে, এতক্ষণ একটা সোফা দখল করে থাকার নিয়ম নেই নাকি?

তার কাছে যেতেই সে ইঙ্গিতে একটি লোককে দেখিয়ে দিল।

ধরবাবু তা হলে এসে গেছেন!

একজন দীর্ঘকায় ব্যক্তি এগিয়ে যাচ্ছেন লিফ্টের দিকে। প্যান্ট ও হান্ডেল শার্ট পরা, হাতে ব্রিফ কেস ও একটি রেইন কোট! ভূরূটা একটু উঁচু করা, সামুক্ষ মানুষদের মুখ এরকম হয়।

ইনি এখন যাবে যাচ্ছেন, এক্ষনি ওকে বিরক্ত করা কি ঠিক ইবে? এর পরে যদি স্বান করার জন্য বাথরুম ঢুকে পড়েন, তা হলে কতক্ষণ লাগবেন কে জানে! তার পরেও যদি ঘরের বাইরে 'ডু নট ডিস্টাৰ্ব বুলিয়ে দেনং?

ধরবাবু লিফ্টের জন্য অপেক্ষা করছেন, আমি তার পাশে গিয়ে বললাম, আপনার জন্য একটা প্যাকেট আছে।

তিনি হাত বাড়িয়ে সেটা নিলেন। আমার দিকে ভাল করে তাকালেও না।

আমাকে বেয়ারা ভেবেছেন, তাতে ওর দোষও নেই, সেরকম মনে করাই তো স্বাভাবিক। দাদাই তো আমাকে বেয়ারা করে পাঠিয়েছে।

আমার দায়িত্ব শেষ। আমি বললাম, এটা আপনার হাতে হাতে পৌছে দেবার কথা ছিল। আচ্ছা নমস্কার।

ধরবাবু একবার প্যাকেটটার দিকে দেখলেন, তারপর আমার দিকে। বেশ কয়েক পলক কৌতুহলের সঙ্গে আমাকে পর্যবেক্ষণ করে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি রঞ্জনের ভাই?

আমি মাথা নাড়লাম।

লিফট এসে গেছে, ধরবাবু উঠলেন না। এক পাশে সরে গিয়ে বললেন, শোনো, রঞ্জন আমাকে তোমার একটা চাকরির জন্য বলেছিল। রঞ্জন আমার অনেক দিনের চেনা। তোমার একটা চাকরির ব্যবস্থা হতে পারে। বস্বেতে। তোমার কলকাতা ছেড়ে বাইরে যেতে আপন্তি নেই আশা করি।

আমি চিন্তা করার সময় পেলাম না। আবার দু'দিকে মাথা নেড়ে বললাম, না।

উনি বললেন, গুড। তোমার সঙ্গে দু' চারটে কথা বলা দরকার। কিন্তু আজ আমি বড় টায়ার্ড। কাল..লেট মি সি, কাল আমি সারা দিন ব্যস্ত থাকব, একটুও সময় পাব না। পরঙ...হ্যাঁ, পরঙ চলে এসো, এখানেই চলে এসো, ঠিক একটায়, আমার সঙ্গে লাঞ্ছ থাবে। তা হলে এটাই ঠিক রইল? গুড! সি ইউ!

হঠাৎ আমার বুকটি খালি হয়ে গেল! এ আমি কী বলে ফেললাম? আমি বস্বেতে চাকরি করতে যাব?

হোটেলের বাইরে এসে প্রবল বেগে মাথা নাড়তে নাড়তে বলতে লাগলাম, না, না, আমি বস্বে যাব না। কিছুতেই যাব না। আমার চাকরির দরকার নেই!

বস্বেতে গেলে কতদিন দেখতে পাবো না মুমুক্ষে সকালবেলা ঘূম থেকে উঠে হঠাৎ একদিন মুমুক্ষে দেখার আনন্দ আর কোথায় পাবো? আমি মুমুক্ষে চাই, মুমু যতই ছেলেমানুষী আবদার করুক, সব মেটাবো আমি। সেই আগের বারের মতন মুমু যদি বাড়ি থেকে পালাতে চায়, আমি নিয়ে যাবো ওকে, একটা অচেনা ছেট্ট রেল টেক্সেনে পাশাপাশি বসে গল্প করবো সারা রাত, ওর কাঁধে হাত রাখবো, ওকে আমার বুকে টেনে আদর করবো...

অ্যাই নীললোহিত, আবার ঐ সব চিন্তা? মুমুর কাছ থেকে পালাবৎ জন্যই তো তুমি দিকশূন্যপুরে যেতে চাইছিলে।

ঠিক, শুমুর কাছ থেকে সরে যেতেই হবে। সদ্য যৌবনের চোখ ও পৃথিবীকে দেখতে শুরু করেছে, এখন আমি ওকে আঁকড়ে ধরতে যাবো কেন? ক্ষয়ায় যে এরকম চিন্তা করেছি, এটা জানতে পারলেই চন্দনদা আমার মাথা ফাটিয়ে ফেরেও!

কিন্তু কাল সকালেই যে মুমু আসবে? তখন যদি আমি মাথা ঠিক রাখতে না পারি? কাল ওকে ফেরানো দরকার। যদি খুব বৃষ্টি হয়, তা হলে ফেড়ায় চড়াটড়া মাথায় উঠে যাবে। শেষ রাত থেকে বৃষ্টি হলে মুমু নিশ্চয়ই আসবে না।

কিন্তু কোথায় বৃষ্টি! ধরবাবুর হাতে রেইন ব্রেস্ট বোস্বেতে নিশ্চয়ই বৃষ্টি হচ্ছে খুব। কলকাতার আকাশ যে ঠা-ঠা করছে। রাতগুলো প্রত্যন্ত ধারালো।

আল্লাহ ম্যাঘ দে, পানি দে...আল্লাহ ম্যাঘ দে, পানি দে...

ওরা রেসফোর্সের কোণটায় দাঁড়ায়। কিন্তু দুরত্ব টগবিংগে রেসের ঘোড়া নয়, ওদের সঙ্গে থাকে গোটা কয়েক ছোট ছোট টাটু ঘোড়া, বেতো বেতো চেহারা। তারই মধ্যে বেছেটেছে যেটা খানিকটা বাঁচকচকে, সেটা নেওয়া হলো মুমুর জন্য।

নীল রঙের জিনসের ওপর হলুদ টি শার্ট, সেটা আবার শুঁজে পরা, তাতো বড় বড় অঙ্গে লেখা, হারি আপ, পৃজ! মাথার চুলে সাদা রিবন বাঁধা। গোড়ালির কাছে প্যান্ট একটু গোটানো। নর্থ স্টার জুতো পরা। মুমুকে দেখাচ্ছে অনেক বড়, অনায়াসে উনিশ-কুড়ি মনে করা যায়।

এমন রঙিন পোশাকে মুমুকে আরও ঝলমলে দেখাচ্ছে, তাপহীন রোদ পড়েছে ওর মুখে, সমস্ত শরীরে সুস্থান্ত্রের দীপ্তি।

রেকাবে একটা পা রেখে, আমার কাঁধে ভর দিয়ে ঘোড়াটায় চাপলো মুমু। তারপর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে চোখ দুটো নাচিয়ে বললো, বু, তুমি চুপটি করে এখানে দাঁড়িয়ে থাকো!

প্রথমেই বেশ জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল মুমু। ঘোড়াওয়ালাটাও দৌড়ে গেল ওর সঙ্গে সঙ্গে। মুমু তেজী মেঘে, এক-আধবার পড়ে গেলেও এমন কিছু আসবে-যাবে না। সাইকেল শিখতো গেলেও কয়েকবার আঁচাড় খেতেই হয়।

আল্লা দয়া করে মেঘ দিয়েছেন শ্রেষ্ঠ পর্যন্ত, কিন্তু পানি দেননি। অনেক দিন পর আজ কলকাতার আকাশ মেঘলা।

আমি নিজের কাঁধে একবার হাত রাখলাম। যে জ্যায়গাটা মুমু একটু আগে ছুঁয়ে দিয়েছে।

এর আগে তো মুমু কত দস্যিপনা করেছে আমার ওপর। পিঠের ওপর দাঁড়িয়েছে, কখনও কান ধরে টেনেছে। অথচ আজ সে আমার কাঁধে শুধু একবার হাত রেখেছে, তাতেই রোমাঞ্চ হচ্ছে কেন? মনে হয় যেন ওর স্পর্শের সুগন্ধ এখনও লেগে আছে শরীরে।

সুগন্ধ আবার কী! মুমু কোনো পারফিউম মাখে না। নীপা বউদির কড়া নির্দেশ হ্যাজুয়েট হবার আগে মেয়ের কোনো রকম বিলাসিতা চলবে না। একদিন মুমু লুকিয়ে তার মায়ের লিপস্টিক মেখেছিল, সে জন্য কী দারুণ বকুনি খেতে হয়েছিল তাকে।

ফুল ফোটার সঙ্গে মেঘেদের ঘোবনের তুলনা দেওয়া হয় বাবে বাবে। ঘোবন-উদ্গমের কি সত্যিই একটা সুগন্ধ থাকে! প্রত্যেক মেঘের আলাদা আলাদা সুগন্ধ। প্রথিবীতে এত মানুষ, কিছুতেই একজনের মতন হ্রবহ আর একজনকে সেপ্ট্যুল হয় না। গল্প-উপন্যাসে ছাড়া, আর যমজরা তো ব্যক্তিক্রম, তারাই বা ক'টা। এত আলাদা আলাদা মুখের ডিজাইন কে করে? এটা যদি ভগবানের দায়িত্ব হয়, তা হলে তো তাঁর কোটি কোটি সহকারী লাগবে, পাঁচশো কোটি মানুষের মুখের ছবি আঁকবে কি সোজা কথা! এ ছাড়াও কত মারা যাচ্ছে, আরও কত জন্মাবে। কিংবা, ভগবানের প্রিয়াল বিশাল সুপার কম্পিউটার আছে?

এত মানুষের যেমন আলাদা মুখ, তেমনি আলাদা গন্ধ। আমার শরীরে আমি মুমুর আঙুলের গন্ধ এখনও টের পাচ্ছি। মুমু ফিরে এলৈই ওর দু' হাত জড়িয়ে গন্ধ শুঁকে দেখবো, মেলে কি না।

এই রে, আমি সাত্য সত্য এত দুর্বল হয়ে যাচ্ছি! মুমু চোখের আড়াল হয়ে গেছে বলে আমার মধ্যে একটা ছটফটানি হচ্ছে; কখন ও আসবে, কখন ও আসবে? কেন দেরিঃ করছে!

ভোরবেলায় ময়দান বেশ জনবহুল; ঘোড়ায় চড়া শিখে আর ক'জন! পদাতিকের সংখ্যা অজস্র। মোটা, বেঁটে, ঢাঙা, থলথলে, সিডিসে, কেডস জুতো পরা নারী, রাঁকি হাফ প্যান্ট পরা বৃন্দ, তোয়ালে-জামা পরা, চঙ্গু-লাল খোয়াবি-না-ভাঙা মাতাল, দাদুর সঙ্গে নাতি, গামড়া-মুখো স্বামী-স্ত্রী, কুকুর সঙ্গে নিয়ে বড়বাবু মেজবাবু ছোটবাবু সবাই এসেছে স্বাস্থ্য ফেরাতে। কিছু ছেলে ফুটবল পেটাচ্ছে, তারা কোনোদিন খেলোয়াড় হবে না; কিছু আধে-বুড়ো প্রাতর্ভরণের নামে মিজেকেই ফাঁকি দিয়ে বেঞ্চে বসে রাজা-উজির ওড়াচ্ছে। ডিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের চুড়ায় পর্যটিক এবং ঘূম ভাঙ্গনি।

এ তো ফিরে আসছে মুমু! ওকে দেখা মাত্র আমার বুকের মধ্যে একটা টেনিস বল লাফালাফি শুরু করে দিল। ও কবে আমার চোখের আড়ালে এমন দীপ্তিময়ী হয়ে উঠলোঁ; ঘোড়াটার রাখ ধরে সোজ টানটান হয়ে বসে আছে মুমু, আমার মনে হলো, এই ময়দানে আর কোনো জনমনুষ্য নেই। এই তো তেপান্তর, একটা ক্ষণেও চূড়া গাছের তলায় আমি দাঁড়িয়ে আছি এক। মুমু আমার দিকেই ছুটে আসছে, কোনো দুর্ঘ থেকে পালিয়ে আসছে এক বন্দিনী, সে এক্ষুনি কাছে এসে আমার বুকে বাঁশিয়ে পড়বে।

আমি দু' হাত দাঁড়িয়ে দিলাম।

মুমু আমার সামনে থাধলো না, একবলক মাত্র চেয়ে সমান বেগে ছুটতে লাগলো সামনের দিকে। ঘোড়াওয়ালাটার পাঊর নেই। টাঁটুটা জোরে ছুটছে, যেন সে বুশি হয়েছে এই যাত্রিনীকে পেয়ে।

প্রথম দিনেই এতটা ভালো শিখে গেল মুমু?

কয়েক মাস আগে বাবা-মায়ের সঙ্গে ভুটান বেড়াতে গিয়েছিল, সেখানে বোধ হয় খোড়ায় চেপেছে কয়েকদিন, সেই থেকে অশ্঵ারোহণের নেশা হয়েছে;

মুমুর ঘোড়াটার পাশে পাশে যাচ্ছে একটা বিশুট রঙের মার্কতি গাড়ি। মুমু সেদিকে চাইছে মাঝে মাঝে। হাসছে। ও গাড়িতে চেনা কারকে দেখতে পেয়েছে বোধ হয়

একটুকুণ্ঠের মধ্যেই আমার চোখের আড়ালে চলে গেল।

মুমুর গায়ের জামাটায় লেখা, হারি আপ, প্রিজ। আজকাল এইসব জামায় কত বকম ছবি আর যাপীই যে থাকে, সব মানে বোঝা যায় না। টি এস এলিয়টের একটা কবিতায় আছে, 'হারি আপ, প্রিজ, ইঁ'স টাইম' কিন্তু জামা যাবা বানায়, তারা কি টি এস এলিয়টের ক.ব.ও. পড়ে? মুমুর বয়েসী ছেলেমেয়েরাও পড়ে না।

আঁও আমাকে চন্দননগরে যেতে হবে মানসের মানসীকে অনুসরণ করে কথা দিয়ে ক্ষেত্রে যেতেই হবে, উপায় নেই।

কাল দুপুরে দেবেন্দ্রনাথ ধরের সঙ্গে আহার প্রহণ করার কথা থেতে থেতে চাকরির ইন্টার্ভিউ। সেই খাবার মনুষের হজম হয়! প্রত্যেক দিনই একটা করে একক মাঘাট সৃষ্টি হলে আমি দিকশূন্যপুরে যাবো কবে? টাকাটা ও জোগাড় করতে হবে।

এর মধ্যেই নরম বোদ গরম হতে শুরু করেছে, শুধ যা জমেছে, তা কবে বৃষ্টির জন্য তৈরি হবে কে জানে।

আমি যে-গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে আছি, তার মগডালে বসে দুটো পাখি অনেকক্ষণ ধরে কী যেন বলাবলি করছে। কী পাখি আমি চিনি না! অনেকটা কুবো পাখির মতন।

হঠাৎ খেয়াল হলো, আরে, এ দুটো যে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, ওদের কথা এখন আমি স্পষ্ট  
বুঝতে পারছি। আমাকে নিয়েই আলোচনা করছে ওরা।

—ওরে দ্যাখ দ্যাখ, এই গাছতলায় এটা ছেলে কখন থেকে হাবার মর্তন দাঁড়িয়ে  
আছে। একটা মেয়ে ঘোড়া দাবড়াচ্ছে, আর ও এক জায়গায় নট নড়ন্তড়ন।

—ও যে প্রেমে পড়েছে তা বুঝছিস না, ব্যাঙ্গমী। দেখছিস না মেয়েটার দিকে কী  
রকম গদগদ ভাবে তাকিয়ে থাকে? আমি প্রথম যখন তোর প্রেমে পড়েছিলাম, তখন  
আমিও তোর দিকে ঐভাবে চেয়ে থাকতাম।

—এখন তুমি ঐভাবে অন্য নচার মেয়ে পাখিগুলোর দিকে তাকাও। আমার দিকে  
চাইলেই তোমার চোখ চুল্লুচ্ছ হয়ে যায়। পরশুদিন লুকিয়ে লুকিয়ে তুমি অন্য একটা  
মেয়ের সঙ্গে গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে গিয়েছিলে।

—আরে যাঃ, তুই খালি অন্য দিকে কথা ঘোরাস। হচ্ছে এই ক্যাবলা ছেলেটার  
কথা। তোকে ছেড়ে আমি কোনোদিন অন্য কোথাও যেতে পারিঃ?

—বুঝেছি। তা এই হোড়াটা যে প্রেমে পড়েছে, ওর কিছু হিলে হবে?

—মাথা খারাপ নাকি। একবার বিয়ের প্রস্তাব তুলে দেখুক না, চাঁটি খাবে চার দিক  
থেকে। মেয়েটাকেও তো ও কিছু বলেনি। সবই ওর মনে মনে। আসলে যে প্রেমে  
পড়েছে, সেটা ও নিজেই এখনও স্বীকার করতে চায় না। প্রেম রোগ, বুঝলি, প্রেম রোগ;  
ওর প্রেমিক হয়ে ওঠার সৎসাহস নেই, প্রেম রূগ্নী হয়ে কষ্ট পাবে।

—ওরকম আমি চের দেখেছি। প্রেম প্রেম ভাব করে ঘুর ঘুর করে, মুখ ফুটে কিছু  
বলতে পারে না। এক হ্যাঁচকা টানে বুকে নিয়ে যে বলবে আমি তোমাকে চাই, সে  
মুরোদ নেই। শুধু ফোঁস ফোঁস করে দীর্ঘস্থাস ফেলবে। ন্যাকা।

—টাটা স্নেকারের উল্টো দিকের রেনট্রি গাছের ব্যাঙ্গমা ছোকরার কথা তোর মনে  
পড়ছে বুঝি? সেও তোর প্রেমে পড়ে খুব ঘুর ঘুর করত।

—এবার তুমি কথা ঘোরাচ্ছ। হচ্ছে এই মানুষ ছোকরাটার কথা। হ্যাঁ গা, এই প্রেম  
রোগ সারাবার ওষুধ নেইঃ!

—ওষুধ ঠিক নেই, তবে কয়েকটা জিনিস মেনে চললে কিছুটা উপশম হতে পারে।  
তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে, নিরামিষ খেতে হবে।

—অ্যাঃ, ম্যাগো। নিরামিষ শুনলেই আমার গা গুলোয়। গোটা দু' এক কেঁচো, আর  
গোটা পাঁচকে গুবরে পোকা অস্তত না খেলে আমার তো মনে হয় কিছুই খাইনি। আমরা  
পাখিরা বাবা শুধু ঘাস-পাতা আর আলু-পটল খেয়ে বাঁচতে পারি না।

—তোর-আমার কতদিন বিয়ে হয়ে গেছে, আমাদের এখন লালো ভালো বলবর্ধক  
প্রেটিন হাওয়া দরকার, না হলে যে প্রেম জাগতেই চায় না। কিন্তু তুম্মোর অবিবাহিত  
ছোকরাদের অত মাছ-মাংস খাবার দরকার কী? তাতে জওয়ানি উচ্চলে ওষ্ঠে, প্রেমের জন্য  
ছটফট করে একদম নিরামিষাষী হতে পারলে মুনে বেশ একটা শুক্র ভাব আসে, তখন  
আর তেজে ডগোমগো হয়ে মেয়েদের পিছু পিছু ছোটাছুটি করতে হয় না। প্রেম রোগ  
সারাবার জ্বল্য নিরামিষ আহার অতি উপকারী।

—শুধু ওঠেই হবেঃ

—আরও কিছু কিছু সংযম দরকার। সকালে বিকেল জ্পতপ করলে ভালো হয়।  
মেয়েটার কথা একেবারে ভাবলে চলবে না, চোখ বুজে কোনো ঠাকুর-দেবতার কথা চিন্তা  
করে বসে ধূকতে হবে স্থির হয়ে।

— ঠাকুর দেবতা কী জিনিস রে, ব্যাঙ্গমা?

— ও মানুষদের আছে অনেক রকম। ভগবান, এ দেবতা সে দেবতা, নিরাকার ঈশ্বর এই সব আর কি।

— আমাদের পাখিদের তো ওসব কিছু নেই?

— মানুষরা তো খুব হেলেমানুষ, তাই ওদের ওসব লাগে। আমরা পথিরা ওদের থেকে অনেক উন্নত জাতি, দেখিস না, সেই জন্য আমরা ওদের থেকে কত উঁচুতে থাকি।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, প্রেম রোগ সারাবার জন্য আর একটা বিশেষ প্রক্রিয়া আছে। যে মেয়ের সম্পর্কে প্রেম জাগে, তার মায়ের কাছে গিয়ে সর্বক্ষণ বসে থাকতে হয়। মায়ের চেহারার প্রশংসা করতে হয়, মায়ের প্রত্যেকটা কথা শুনে বলতে হয়-হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন। মেয়েটার মা যদি কখনও বলেন, বাড়িতে কাজের লোকটা নেই, দুশো গ্রাম শুকনো লঙ্ঘা আনানো দরকার, তখন ছুটে গিয়ে আড়াইশো গ্রাম শুকনো লঙ্ঘা এনে দিতে হয়। বিয়ে হবার আগেই যে ছেলে তার হবু শাশুড়ির খুব ভজ হয়ে যায়, মেয়েরা তাদের দু' চক্ষে দেখতে পাইবে না। মনে করে, মেয়ের থেকে মাকে বেশি পছন্দ। মেয়েরা সেই ছেলেকে আর বাড়িতে চুক্তেই দেয় না।

— তুই আমার মায়ের সঙ্গেও প্রেম করার চেষ্টা করেছিলি, না রে ব্যাঙ্গমা?

— তা হলে কি তুই তোদের বাসায় আমাকে একদিনও ঠাই দিতিস? ওরে ব্যাঙ্গমী, ঐ দ্যাখ, রেস কোর্সের বেড়ার ধারে কতগুলো পুরষ্ট, মোলায়েম, তেল চকচকে কেঁচো কিলবিল করছে। আহা, মরি, মরি, দেখেই জিভ দিয়ে জল বরছে, চল, প্রাতরাশটা সেরে আসি।

— হ্যাঁ, চল যাই। তা হলে এ ছেলেটার প্রেম রোগ কি সারবে?

— নির্ভর কারছে, দি এইসব নিয়মগুলো মানে। তা ছাড়া দেখে বুঝছিস না, ছেলেটা বেশ পাগলাটে ধরনের। কখন কী যে করবে, তা ও নিজেই জানে না।

পাখি দুটো উড়ান দিল গাছ থেকে। যাবার আগে, সকালের খাবারটা খাওয়ার আগে যে-কাজটা সারতে হয়, সেটা সেরে গেল পিচিস পিচিস করে। তার খানিকটা পড়লো আমার মাথায়।

এই সময় ফিরে এলো মুমু। ঘোড়া চড়ায় পরিশ্রম আছে। বিলীয়মান চন্দন সাজের ম্তন তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। কিন্তু তার ঠোঁটের হাসিতে ঝুঞ্চির চিঙ্গমাত্র নেই।

সে কিছু বলার আগেই আমি ঘোড়াটার পেট ঘেঁষে দাঁড়ালাম, যাতে নামবার সময় সে আমার কাঁধে হাত রাখে মুমু কিন্তু আমাকে না ছুঁয়েই এক লাফে নেমে পড়লো। আমি তার দুটি হাত ধরারও সুযোগ পেলাম না, মুমু জিঞ্জেস করলো, ~~কুক্তি~~ বাজে গো? দেরি হয়ে যায়নি তো?

বিস্কুট রঙের ফিয়াট গাড়িটা এসে থামলো আমাদের খুব কাছে। তার থেকে নেমে এল দুটি ছেলে, দু'জনেরই বয়েস কুড়ি-একুশের মধ্যে, সুশ্রী, সপ্রতিত চেহারা, পোশাকের চাকচিক্য দেখে বোৰা যায়, সচ্ছল পরিবারের। ছেলে দুটির চেহারা ও পোশাকে এমনই মিল যে মনে হয়, একই কারখানায় তৈরি।

মুমু বললো, বু, তোমার সঙ্গে আলাপ করিবেন্নিহি, এরা আমার বন্ধু, ভিজে আর আনুপম।

দুটি ছেলে এক সঙ্গে নমস্কার জানাবার জন্য হাত তুললো।

প্রথম ছেলেটি বললো, নমস্কার, আঙ্কল।

দ্বিতীয় ছেলেটি বললো, আই হ্যাভ হার্ড অ্যাবাউট ইউ ফ্রম মুমু। আমি অ্যাকচুয়ালি মুমুদের নেবর, খুব কাছেই থাকি অ্যাক্স দা স্ট্রিট। শী ইজ মাই ব্যাডমিন্টন খেলার পার্টনার।

প্রথম ছেলেটি বললো, বল্হ টাইম ধরে আপনি স্ট্যাণ্ডিং হিয়ার অল বাই ইয়োরসেলফ, আপনার জরুর কোষ্টে হয়েছে।

এ রকম বিচিত্র ভাষা শুনলেই আমার গা জুলা করে।

তা ছাড়াও আমার ঘটকা লেগেছে নাম দুটো শুনে।

ভিজে আবার কী রকম নাম? ভিজে, শুকনো, ঘটখটে এই রকম নাম রাখায় রেওয়াজ হয়েছে নাকি?

আমাকে আঙ্গল বলে ডেকেছে, সুতরাং আমি ওদের তুমি বলতেই পারি।

প্রথম ছেলেটির দিকে তাকিয়ে জিজেস করলাম, তোমার নামটা কী বললে, আমি ঠিক ধরতে পারিনি।

ছেলেটি বললো, ভিজে। ভিজে গুণ্টা।

তবু বুঝতে না পেরে আমি বললাম, এখনও বুঝতে পারছি না। ভিজে? বানান কী? মুমু বললো, মীলকা, তুমি কী রকম বাংলা বাংলা করে বলছ। ভিজে নয়। ভিজেয়। ছেলেটি বললো, তি আই জে এ ওয়াই।

আমি বললাম, তবু ঠিক বুঝতে পারছি না। নামের তো একটা মানে থাকবে। হিন্দিতে কী বানান লেখো।

মুমুই বলে দিল, ব-য় হস্সি বগীয় জ আর অন্তস্থ য়।

ওঃ হো, বিজয়! কিন্তু বিজয় নামটা কী করে ইংরিজি বানানে ভিজেয় হয়ে যায় আর ছেলেটি সেই নামই বলে? বাংলা বিজয় হিন্দিতে এতখানি বদলে যায় নাকি?

এ বিষয়ে আর কিছু বললে জ্যাঠামশাইগিরি হয়ে যাবে। আমাকে কাকা বলে পরিচয় দিয়েছে মুমু।

অন্য ছেলেটি বাঙালি। তাকে জিজেস করলাম, তোমার নাম আনুপম? এর কোনো মানে আছে? অনুপম শুনেছি।

ছেলেটি আমার এই মাস্টারি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে তাচ্ছিল্যের সুরে বললো, আমার ক্লাসের সবাই আনুপমই বলে। মেক্স নট মাচ ডিফ্রেস! আমরা একটা স্টপ ওয়াচ নিয়ে ময়মে ফলো করছিলাম, শী ওয়াজ রাইডং চোদ্দ পনেরো মাইল স্পীডে, নট ব্যাড, নট ব্যাড অ্যাট অল। মুমু, প্রথম দিনেই তুমি ডুয়িং ফাইন। তাই না রে, ভিজে?

ভিজে বললো, একদম বিলকুল বুঝাই যায় না। দিস ইজ হার ফার্স্ট ডে হামি আগে বলিনি, শী ইজ আ রিয়েল ট্যালেন্টেড স্পোর্টস পার্সন!

এই ব্যাপারে, আগে থেকেই জানতো যে মুমু এখানে আজ ঘোড়ায় চড়া শিখতে আসবে! একেবারে স্টপ ওয়াচ পর্যন্ত এনেছে। এরা দু'জনেই মুমুর অনুরাগী। মুমুই এদের আসতে বলেছে!

তা হলে আমি কে? শিখন্তী?

ঘোড়াওয়ালাটার পাতা নেই। ওর কাছে ঘোড়াটা জিম্মা করে দিয়ে তারপর যেতে হবে।

মুমু ওদের দু'জনের সঙ্গে গল্প শুরু করে ছিল। ওদের ভাষা বিষয়বস্তুর সঙ্গে আমি যোগ দিতে পারছি না। ছেলে দুটির থেকে আমার বয়েস বড় জোর পাঁচ-ছ' বছর বেশি

হবে। অথচ ওদের সঙ্গে যেন অনেক তফাত। আমি মুমুর কাকা এবং অভিভাবকদের প্রতিনিধি, সেই জন্যই কি আমাকে ভারিকি ভাব করতে হবে?

তফাতটা আসলে বয়েসের নয়, কালচারের।

যোলো-সতেরো বয়েসে আমি ছিলাম বইয়ের পোকা। কোনো একটা বই পড়ে খুব আনন্দ হলে বন্ধু-বাক্সবদের সবাইকে সেটা না পড়াতে পারলে শাস্তি হত না। নিজে পয়সা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে বই কিনে বন্ধুদের উপহার দিয়েছি! খেলা সম্পর্কেও খুব উৎসাহ ছিল। ইষ্টবেসেল-মোহনবাগানের জয়-প্রবাজয় নিয়ে কাটাফাটি তর্ক হত বন্ধুদের সঙ্গে। কিন্তু আমাদের বাঙালি জীবনে, শুধু বাঙালি কেন, ভারতীয় জীবনের সঙ্গে মোটর গাড়ী রেসিং-এর কোনো ঘোগাঘোগই নেই। গাড়ির র্যালি হয় বটে মাঝে মাঝে, কিন্তু রেসিং, সেরকম রাস্তাই নেই এ দেশে। রেসিং নিয়ে কখনও মাথা ঘামাইনি। মুমুর অনুরাগী ছেলে দুটি স্পেন্সর কোনো কার রেসিং সম্পর্কে অভিজ্ঞ মতামত দিচ্ছে!

বাংলা বা ইংরিজি, যে-কোনো শব্দের উচ্চারণে একটু খুঁত থাকলেও লজ্জায় মরে যেতাম। মনে আছে, একবার হোটেলের সুট বলে ফেলে দাদার কাছে প্রচণ্ড ধরক খেয়েছিলাম। দাদা বলেছিল, সুট কী রে, সুইট! ঠিকমতন উচ্চারণ না জানলে বাংলায় বলবি! শুধু হোটেলের ঘর বললেই তো যথেষ্ট!

এরা গাড়ির আলোচনা করতে করতে বারবার বলছে, চেসিস, চেসিস! কেউ ওদের বলে দেয়নি কেন যে, ওটার সঠিক উচ্চারণ শ্যাসি। অবশ্য যারা নিজের নামটাই বিকৃতভাবে উচ্চারণ করে তাদের বললেই বা লাভ কী!

বাংলা-হিন্দি-ইংরিজি মিলিয়ে জগাখিচুড়ি ভাষায় কথা বললে কোনো ভাষা সম্পর্কেই তো মমতা জাগবে না। ভালো করে শিখবে না কোনো ভাষাই। যে-কোনো এয়ারপোর্টে গেলেই শোনা যায়, একটা বিকট ভাষায় কথা বলছে অধিকাংশ যাত্রীরা।

বিজয়ের চেয়ে অনুপম নামের ছেলেটির ওপরই বেশি বিরক্ত বোধ করতে লাগলাম অ..মি। বিজয় তবু কলকাতায় থাকে বলে ইংরিজির সঙ্গে বাঙা ভাঙা বাংলা বলার চেষ্টা করছে। কিন্তু অনুপম তো পুরো একটা বাক্যও বাংলা বলছে না। বাড়িতেও এইরকম বলে? নাকি, ও প্রাণপনে বিজয়ের অনুকরণ করছে?

আজকাল বাংলা সিনেমা যেমন বোমাইয়ের কুচ্ছিত সিনেমার নকল করে, সেইরকম এক শ্রেণীর বাঙালি ও প্রাণপনে মাড়োয়ারিদের নকল করার চেষ্টা করে যায়। এই এখন বাঙালির কালচার!

গাড়িটা এ বিজয় নামের ছেলেটির। একুশ বছরের ছেলে ভোরবেলা গাড়ি নিয়ে এসেছে একটি মেয়ের অনুসরণ করতে! মুমু ওর গার্ল ফ্রেন্ড নাকি? তাহলে অনুপম সঙ্গে এসেছে কেন? চামচা?

মোড়াওয়ালা এসে গেছে, তার সঙ্গে কথা চুকিয়ে আমি মুমুকে বললাম, চল এবার! মুমু বললো, ভিজে বলছে, ওর গাড়িতে আমাদের পৌছে দেবে!

বিজয় আমার দিকে তাকিয়ে বললো, আংক্ল, পুঁজি আসুন, আপনাদের লিফ্ট দিচ্ছি, তার আগে উই সুড হ্যাভ অ কাপ অফ টি সামহোয়্যার।

অনুপম বললো, গুড আইডিয়া, লেঠস গো টু পার্ক হেটেল!

মুমু বললো না, আমি এখন সোজা বাড়ি যাবো। চাপ্টা যাবো না। আই হ্যাচ হোম ওয়ার্ক টু ফিনিশ। নীলকা, গাড়িতে উঠে পড়ো।

ওদের গাড়িতে ওঠার একটুও ইচ্ছে নেই ক্ষেমার হাঁসেদের মধ্যে বকের মতন গোমড়া মুখে বসে থাকার কোনো মানে হয় নাফি। আমি এখান থেকে বাসেই চলে যেতে পারি।

সেই কথাই বলতে গিয়েও থেমে গেলাম।

এই সব আধা-ইংরিজি বলা ট্যাশ মার্কা ছেলেমেয়েদের আমরা অবজ্ঞা করি, দুর থেকে সমালোচনা করি, কিন্তু সামাসামনি তো কখনও প্রতিবাদ করি না। ওরা বাংলা ভাষার অপমান করে, আমরা মেনে নিই! এইরকম চলতেই থাকবে, তা হলে তো ওরা কখনও শোধবাবে না!

মুমুর সঙ্গে সকালবেলা যে এই দুটি ছেলে এখানে দেখা করতে আসবে, তা কি চন্দনন্দা-শীপা বউদি জানে? মুমু আমাকে সঙ্গে আনতে চাইলো কেন? তা হলে আমার দায়িত্ব মুমুর বাড়ি পৌছানো পর্যন্ত সঙ্গে থাকা।

গাড়ির রাস্তায় আমি ছুঁ-হাঁ ছাড়া বিশেষ কিছু বললাম না। ছেলে দুটিকে ভালো করে চেনা দরকার। মুমু বসেছে সামনে, বিজয়ের পাশে। অনুপম মুমুর ঠিক পিছনে। ঝুঁকে ওদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অনুপম মাঝে মাঝে ইয়ার্কি ছলে ফুঁ দিছে মুমুর ঘাড়ে। ছুঁ, বেশ ভালোই ভাব আছে দেখছি মুমুর সঙ্গে।

মুমুর সঙ্গে আমিও নেমে পড়লাম!

ওদের গাড়িটা বেরিয়ে যাবার পর মুমু বললো, বু, তুমি ওপরে আসবে? বাবা বোধ হয় নেই, তুমি মা'র সঙ্গে গল্প করতে পারো। আমাকে এক্সুনি পড়তে বসতে হবে।

আমি মুমুর মুখের দিকে কয়েক পলক চেয়ে রইলাম। এই মুখখানি আমার বুকটা যে কীরকম পুড়িয়ে দিছে, তা তো ও জানে না।

কত ইচ্ছে ছিল, ওর হাত দু'খানি জড়িয়ে ধরে গন্ধ শোকার। ভেবেছিলাম, ফেরার সময় যয়দানের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আসবো অনেকটা। আশা ছিল, বাসে ওঠার সময় আলতো করে ওর পিঠে একবার হাত রাখবো। মুমুর হলুদ টি শার্ট ভেদ করে দেখা যাচ্ছে ওর ত্র্বা-র রেকা। একদিন মুমুর সঙ্গে আমি সমুদ্রে স্নান করতে নামবে: দু'জনে হাত ধরে ঢেউ ভেঙে ভেঙে চলে যাবো অনেকটা দূরে।

এ সব কথা এখন বলা যাবে না।

আমি বললাম, না.রে, আজ আমি ওপরে যাবো না।

মুমু বললো, আবার কাল কাল আর্লি মর্নিং-এ তুমি এসে আমায় ডাকবে। সাড়ে পাঁচটার মধ্যে। ডোনচ যু ফরপেটে।

মুমু আমার সঙ্গেও ইংরিজি বলতে শুরু করেছে।

## ॥ ৪ ॥

কোনোদিন বি-বা-দী বাগে অফিস করলাম না, অথচ অফিস-ভাঙ্গা ভিড়ের বাস ও লোকাল ট্রেনে চাপার অভিজ্ঞতা হয়ে গেল আমার বাপরে বাপ, এক ভিড়ে ভিড়েওড়া থেকে চন্দননগর পুরোটাই দাঁড়িয়ে আসতে হলো।

শ্রেয়া দণ্ড ও বসবার জায়গা পায়নি।

সে দাঁড়িয়ে রইলো অনেকটা ভেতরের দিকে, আমি দৃঢ়জ্ঞের কাছে। সে আমাকে দেখতে পাবে না। আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি একটু একটু লোকজনের মাথার ফাঁক দিয়ে। মাঝখানের দু'একটা টেশনে লোকজন নামাঙ্গায়ার সময় তার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়ে গেল। তাতেও কিছু আসে যায় না। এই কামরায় অন্যান্য মেয়েদের তুলনায় সে বেশ সুন্দরীই বলা চলে, ছেলেরা তো তার দিকে তাকাবেই। এতে নিশ্চয়ই সে অভ্যন্তর হয়ে গেছে।

শ্রেয়ার সঙ্গে রয়েছে আর একটি মেয়ে। সে বেচারির মুখখানি ল্যাপাপোঁছা, হয়তো তার অনেক শুণ আছে। সেটা বোৰা যায় না চেহারা দেখে। চেহারার দিক দিয়ে সে বড়ই সাধারণ।

শ্রেয়া তার সঙ্গেই গল্প করে যাচ্ছে অনবরত। নিত্যাত্মী অন্যান্য পুরুষদের সঙ্গে তার তেমন আলাপ নেই বোৰা গেল। ছেলেরা কেউ গায়ে পড়ে তার সঙ্গে কথা ও বলতে যাচ্ছে না।

মানস আর শ্রেয়া প্রতিদিন একই অফিস বাড়িতে, একই লিফ্টে ওঠা-নামা করছে। অথচ কেউ কারুর সঙ্গে একটাও কথা বলেনি এ পর্যন্ত। এদের সমন্বে করে বিয়ে না দিলে তো বিয়ে হবেই না।

লোকাল ট্রেনে প্রতিদিন যাওয়া-আসা করতে করতে কিছু কিছু কায়দা শেখা হয়ে যায়। আমি তো আর সেগুলো জানি না। তাই কিছু লোক আমাকে কনুইয়ের গুঁতো দিতে লাগলো, কিছু লোক আমার পা মাড়িয়ে নিল, কিছু লোক অথবা ধরকে বললো, সরে দাঁড়ান না!

এইরকম দমবন্ধ ভিড়ে ট্রেনটা যেন চলছে তো চলছোই। কখন চন্দননগরে পৌছোবে?

একটা স্পেশনে হড়হড় করে অনেক লোক নামতে শুরু করতে স্বন্তির নিষ্ঠাস ফেলে ভাবলাম, যাক, এবাব তবু এটু বসা যাবে।

উকি মেরে দেখি, সেটাই চন্দননগর টেশান ; শ্রেয়াও নামছে সেখানে।

ওর বাড়ি টেশানের খুব কাছে হলে বামেলা ছিল না। কিন্তু শ্রেয়া এটা সাইকেল রিঞ্জা নিল।

মানসের পরামর্শে আমি একটা খবরের কাগজ এনেছি বটে, কিন্তু এই সঙ্গেবেলা, রাস্তার আলো তিম টিম করছে, এর মধ্যে চলত রিঞ্জায় বসে কাগজ পড়ার ভান করলে লোকে আমাকে পাগল ভাববে না?

অচেনা সওয়ারি দেখলে রিঞ্জাওয়ালারা আগে দরাদরি করতে চায়। নিত্যাত্মীরা এদের মুখচেনা রিঞ্জাওয়ালা যদি জিজেস করে, কোথায় যাবেন? আমি কী উত্তর দেবো? চন্দননগর আগে বার দু'-এক এসেছি বটে, গঙ্গার ধারের ধানিকটা পথ বেড়াবার পক্ষে অতি চমৎকার, কিন্তু শহরের ভেতরের রাস্তাঘাট কিছুই চিনি না। শুনেছি, কলকাতার মতন এখানেও শ্যামবাজার, বাগবাজার এই সব পাড়া আছে।

শ্রেয়া আর তার বান্ধবী এক রিঞ্জায় চেপেছে। ওদেরটা চলতে শুরু করার পরে আমি ব্যস্তসম্মত ভাব দেখিয়ে আর একটি রিঞ্জায় উঠে বললাম, চলো-।

যথারীতি সে জিজেস করলো, কোথায় যাবেন?

আমি তাছিল্যের, সঙ্গে বললাম, চলো তো সামনের দিকে।

একবার উঠে বসলো নামিয়ে তো দিতে পারবে না। আমি ছিকুকটা উঁচু করে থাকি, যাতে বোজা যায়, সামান্য বাড়া-ফাড়া নিয়ে আমি মাথা ঘামাইয়া।

ওদের রিঞ্জায় দু'জন আছে, এটা তবু ভালো। দুটি মেয়েকে একসঙ্গে কোনো একটি যুবক কি অনুসৃণ করে? তবে মুশকিল হচ্ছে কী, স্বস্তিসময় আমার মনে হচ্ছে, রাস্তার লোক যেন আমাকে কৌতুহলের সঙ্গে দেখছে, প্রেম্পর বলাবলি করছে, এই নতুন ছোকরা আবাব কোথা থেকে এলো! যদিও মুশকি-দিয়ে বুঝতে পারি, তা সম্ভব নয়, আজকাল কে কাকে নিয়ে মাথা ঘামায়? এই শহরে এত মানুষ। সবাই সবাইকে চেনে

নাকি? তবু এরকম মনে হয়। রাস্তার কোনো একটা লোকের সঙ্গে চোখাচোখি হলেই বুকটা কেঁপে উঠে, নিশ্চয়ই ঐ লোকটা কিছু সন্দেহ করেছে।

আমার মাঝে যারেই বুক টিপটিপ করছে বটে, কিন্তু প্রেমে নয়, ভয়ে। শ্রেয়া মানসের মনোনীতা, তাকে মেয়ে বলেই মনে হচ্ছে না আমার মুমু ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো মেয়েকেই এখন মনোযোগের যোগ্য মনে করিন না।

রিঞ্জাওয়ালাকে একবার ডানদিকে, একবার বাঁ-দিকে এই বলে চালাচ্ছিলাম। তাতেও একটা বিপত্তি হলো। শ্রেয়াদের রিঞ্জাওয়ালাটি বুড়ো, তার দু'জন যাত্রিনী। আমার রিঞ্জাওয়ালা নওজোয়ান, উৎসাহে প্রায় মাচের ভঙিতে সে রিঞ্জা চালাচ্ছে, অন্য সব রিঞ্জাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে চায় সে। সরু রাস্তা, উল্টো দিক থেকে অনবরত গাড়ি আসছে, তবু সে একবার শ্রেয়াদের রিঞ্জা ছাড়িয়ে চলে গেল।

মহা মুশকিল! এখন কোন দিকে যেতে হবে বুঝবো কী করে? বার বার পেছন ফির মেয়ে-গাড়ির দিকে নজর রাখা ও যায় না। এক্ষুনি একটা কিছু ব্যবস্থা করা দরকার। অন্য রিঞ্জাটা যদি ডান দিক বা বাঁ-দিকের কোনো গলিতে চুকে যায়?

হাতের কাগজটা ফেলে দিয়ে বললাম, এই দাঁড়াও, দাঁড়াও, কাগজটা পড়ে গেছে!

সে থামলো একটু দূরে গিয়ে। আমি নেমে, ধীরে সুস্থে হেঁটে গিয়ে কাগজটা তুললাম। তাতে অনেকখানি কাদা লেগে গেছে। এই নেংরা কাগজটা তাহে রাখার কোনো মানে হয় না, কিন্তু এই ছুচেটা এক্ষুনি নষ্ট করাও যায় না।

শ্রেয়াদের রিঞ্জাটা আমাদের পেরিয়ে গেছে। তা তো গেল, কিন্তু আমার নওজোয়ান যদি আবার বাই বাই করে চালায়, তাকে কী বলে থামাবো?

অবশ্য আর দরকার হলো না।

খানিক পরেই শ্রেয়াদের রিঞ্জাটা থামলো একটি বাড়ির দরজার সামনে। সাদা রঙের দোতলা বাড়ি। তার বান্ধবী বসেই আছে। সে আরও দূরে যাবে। আমার রিঞ্জাটা এবার ছাড়া দরকার। এই রাস্তা দিয়ে একবার হেঁটে যেতে হবে। সামনেই একটা সিনেমা হল, এখানে নেমে পড়ার অপূর্ব সুযোগ!

ছেলেটিকে থামতে বলার আগেই একটা কাণ্ড ঘটলো।

পাশের গলি থেকে হঠাৎ গাঁক গাঁক শব্দ করতে করতে বেরিয়ে এলো একটা মোটর সাইকের। যে-কোনো গাড়িরই গলি থেকে বড় রাস্তায় পড়ার সময় গতি কমিয়ে দু'দিক দেখে নেওয়া নিয়ম, কিন্তু মোটর সাইকেলটি এলো পূর্ণ গতিতে, সোজা ধাক্কা মারলো আমাদের সাইকেল রিঞ্জায়।

প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগলেও আমি দু'দিকে হাত ছাড়িয়ে সিট ধরে, উল্টে পড়াটা আটকালাম, কিন্তু রিঞ্জা চালকটি ছিটকে পড়েছে রাস্তায়। পথচারীরা হৈ হৈ করে উঠলো।

মোটর সাইকেলটি চালাচ্ছে বাইশ-তেইশ বছরের একটি ছেলে, তার পেছনের সিটে তারই সমবয়সী একজন। একবলক তাকিয়েই মনে হলো, যে ছালাচ্ছে তাকে দেখতে মুমুর বন্ধু নুপম তথা অনুপমের মতন হবহ। অনুপম তো ধোকে মুমুদের পাড়ায়। সেইরকমই বলেছিল আমাকে, সে চন্দননগরে আসবে ক্ষীকরণে, দু'জনের চেহারায় আন্দর্য মিল।

ওদের কিছু হয়নি। ওরা কিন্তু রিঞ্জাওয়ালাটিকে ধূঢ়ি যেতে দেখেও থামল না, তেঁ তেঁ করে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল।

রাস্তার কোনো খোয়া-টোয়াতে লেগে রিঞ্জাওয়ালাটির কপালের একটা পাশ কেটে গিয়ে ঝরবর করে রক্ত পড়ছে। আমি এক লাফে নেমে গিয়ে তাকে ধরে তুললাম,

আরও কয়েকজন পথচারী সহানুভূতি দেখাতে এলো। শ্রেয়া পর্যন্ত এগিয়ে এলো এদিকে।

রিঙ্গাওয়ালাটি কিন্তু বেশ তেজী। সে এক হাতে ক্ষত স্থানটি চেপে ধরে বললো, আমার কিছু হয়নি, কিছু হয়নি!

একজন বেশ দায়িত্ববান গোছের ভদ্রলোকে বললেন, না, না, রক্ত বেরিয়েছে, তুমি ডিসপেনসারিতে গিয়ে ওষুধ লাগাও। না হলে ধূনটক্ষার হয়ে যেতে পারে।

অন্য একজন বললো, মোটর সাইকেলটা ধাক্কা দিল, তারপর দেখলেন, একটু থামলো না পর্যন্ত!

-ছেলেটা কে! এ পাড়ার কেউ নাকি? গলি থেকে বেরলো।

ঐ তো গোপালবাবুর ভাগ্নে। কলকাতায় থাকে, মাঝে মাঝে আসে মোটর সাইকেল নিয়ে।

-আজকালকার ছেলে, দয়া-মায়া-ভদ্রতা সব বিসর্জন দিয়েছে। কলকাতার ছেলেগুলো ধরাকে সরা জ্ঞান করে।

শ্রেয়া একধারে এসে দাঁড়িয়েছে। কোনো কথা বলছে না। তার বাঙ্কবীটি বললো, কাছেই আমার দাদার ডাঙ্গারখানা। রতন, তুমি চলে এসো আমার সঙ্গে।

আমার আর এখানে থাকা উচিত নয়; এরপর যদি আমাকে নিয়ে কৌতুহল শুরু হয়; রিঙ্গাওয়ালার হাতে দশটি টাকা গুঁজে দিয়ে আমি সরে পড়লাম। উচ্চে দিকে খানিকটা হেঁটে শ্রেয়াদের বাড়ির নম্বরটা দেখে নিলাম। দরজার পাশে একটা পিতলের ফলকে নীলাবৃত্ত দণ্ড নামে জনৈক উকিলের নাম লেখা। শ্রেয়া খুব সম্ভবত সেই উকিল ভদ্রলোকের মেয়ে কিংবা বোন।

হনহন করে পা চালিয়ে সোজা পৌছে গেলাম টেশানে।

ফিরতি টেনে ঘোঁষার সময় হঠাৎ টের পেলাম আমরা ষাঁ হাতের এক জায়গায় জুলা করছে। তারপর দেখি, মাঝের আঙ্গুলের গাঁটে খানিকটা ধেতলে গেছে, সেখানে রক্ত জমে আছে।

রিঙ্গা থেকে আমিও উল্টে পড়ে যেতে পারতাম খান্তায় অতি কষ্টে ধরে ফেলার সময় কোনো পেরেক-টেরেকে গুতো লেগে আমার আঙ্গুলের গাঁটের চামড়া উঠে গেছে। এতক্ষণ খেয়ালই করিনি। এমন কিছু ব্যাপার নয়, কিন্তু যদি ধূনটক্ষার হয়; আমরাও কিছু ওষধ লাগনো উচিত ছিল। ট্রেন এসে গেছে যাক গে, অত ভেবে লাত নেই।

ঐ ছেলেটা কি সত্যিই অনুপম! কলকাতার ছেলে, মাঝ বাড়িতে বেড়াতে আসতেই পারে। কিংবা আমারও দেখার ভুল হতে পারে, হয়তো অনুপমের সঙ্গে খানিকটা মিল আছে। ভালো করে তো দেখিনি!

হাওড়া টেশানে মানসকে দেখে আমি অবাক।

আমি কোন ট্রেন, কখন ফিরবো তার তো কিছু ঠিক ছিল না। এখানে তাঁর্থের কাকের মতন দাঁড়িয়ে আছে। একটা বাতত ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেনা।

প্লাটফর্মে ভিত্তের মধ্যে দাঁড়িয়েই মানস জিজেস করলেন কুইর, পুরোটা গিয়েছিলঃ  
—হ্যাঁ।

—বাড়িটা দেখেছিস? কী মনে হলো?

মাঝের ধূরনের বাড়ি। আটালিকাও নয়, বস্তি ও মেঝে।

আর ব্যাপার-স্যাপার কী রকম বুঝলি। অপ্রম থেকে কী কী হলো.....আচ্ছা চল। আগে কাফেটারিয়ায় গিয়ে বসি, চা খেতে থেতে.....

সেখানে গিয়ে বসার পর মানস জিজ্ঞেস করলো। চায়ের সঙ্গে কিছু নিবি? মাটন  
কাটলেট, ডিমের ডেভিল, ফিস ফ্লাইঃ

একটু খিদে খিদে পাছে, একটা কিছু নিলে হয়।

জোরে জোরে মাথা নেড়ে বললাম, না, না, মাঝ-মাংস জাতীয় কিছু চাই না।

— তা হলে ভেজিটেবল চপ বলবো?

ভেজিটেবল চপ জিনিসটা আমি দুঁচক্ষে দেখতে পারি না। ভেতরে বিট-গাঁজর ভরে  
একটা অর্ধাদ্য জিনিস তৈরি হয়। তবু ঠিক করলাম, আজ ভেজিটেবল চপই চেষ্টা করে  
দেখবো।

মানস জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁ, তারপর, তুই আর ও একই কামরায় চাপলি? যাবার  
সময় কিছু ঘটলো?

কিছু না। তোর পছন্দ খুব ভালো রে মানস। শ্রেয়ার ব্যবহার খুব ভদ্র আর সত্য, ওর  
একটি বাঙ্কৰী সঙ্গে থাকে, সেও বেশ ভালো মেয়ে, যদিও সে বেচারিকে দেখতে শুন্দর  
নয়। শ্রেয়াদের বাড়ি দেখেছি, ভদ্র পাড়ার মধ্যে, ছিমছাম বাড়ি, সেটা ভাড়া না ওদের  
নিজের তা কী করে বলবো।

— ভাড়া বাড়ী হলেও ক্ষতি নেই, আমি তো আর সম্পত্তি চাই না।

— বেশ। সে বাড়িতে কত লোক থাকে তা জানি না। তবে দেখে নিরিবিলিই মনে  
হলো। শ্রেয়ার দাদা কিংবা বাবা উকিল। সবাই ঠিক আছে। তবে, আমর একটা আরণ্যের  
কথাও তোকে জানিয়ে দেওয়া উচিত। বলবো;

হ্যাঁ, বলবি না কেন, সব বলবি।

— তোর পছন্দের তারিফ করতে হয় গেয়েটি সত্যিই ভালো। কিন্তু আমার মনে  
হলো, ওর আগে একব'র বিয়ে হয়েছিল, বিধবা কিংবা বিবাহ ছিল।

— অ্যাঁ? তুই কি করে জানলি? তোকে কেউ বলেছে?

— না, কেউ বলেনি। ওকে দেখে আমার এই আরণ্যে হলো। ও পুরুষদের দিকে  
ভালো করে তাকায় না। পারতপক্ষে কথা বলে ন, নিজেকে যেন জুকিয়ে রাখতে চায়।

— যাঃ কী বলছিস, নীলু?

— তোর ঘুথখানা শুনিয়ে গেল কেল, মানস? বিধবা হলে তোর আপত্তি আছে? ঐ  
মেয়েটির পক্ষে আর একবার বিয়ে করা তো খুবই বাড়াবিক

— তা হলে সবই গোলমাল হয়ে গেল। আমার বাড়ির কেউ রাজি হবে না!

তুই যে বলেছিল, তুই নিজের পছন্দ মতন বিয়ে করবি। বাড়ির পছন্দ মানবি না?  
বি-বা-দী বাগে এত মেয়ের মধ্যে তুই শুধু এ একটি মেয়েকেই পছন্দ করেছিল। এখন  
এই সম্মান ব্যাপার শুনে তুই পিছিয়ে যাবি!

মা কিছুতেই শুনতে চাইবেন না আমি তো আর আলাদা হলো হেতু পারি না।

— একটি মেয়ে, দেখতে শুনতে ভালো, ব্যবহার ভালো, দয়া মায়ি আছে, সে শুধু  
বিধবা কিংবা বিবাহ-ছিন্না শুনে তোর মা আপত্তি করবেন? মাকে জু জোর দিয়ে দেবাবাতে  
পারবি না!

— তুই জানিস না, আমাদের বাড়ী কী রকম কলজারেজিট!

ভেজিটেবল চপটি গুড়-হাগড়ল ছাড়া আর কেই খুঁত পারবে না। মাঝ এক টুকরো  
মুখে দিয়েই সরিয়ে রাখতে হচ্ছে। সা শেষ করে স্বাস্থ উচ্চে দাঁড়ালাম।

মানসের কাঁধে একটা চাপড় মেরে বললাম, কেন শুধু শুধু মায়ের নামে দোষ  
চাপাচ্ছিস ভাই? বাধাটা আসল তোর নিজের মনে, ভাই নাম ধাক গে, মুখ শুকলো করে

থাকার দরকার নেই। সবই আমার বানানো। ও মেয়ে বিধৰা-টিধৰা কিছুই না। ও কথা বলে শ্রেফ তোকে একটু ভড়কে দেবার চেষ্টা করেছিলাম। তোর মামাদের পাঠিয়ে দেওখানে। মনে হয় ঠিকঠাক লেগে যাবে।

মানস চোখ পাকিয়ে বললো, আমাকে ভড়কি দিছিলি? শালা—

আমি হাসতে হাসতে বললাম, এখন তো আমাকে শালা বলবিই। তোর জন্য আমাকে যে কত কষ্ট করতে হয়েছে, তা তো জানিব না কখনো। বিয়ের নেমন্তন্ত্র করবি তো?

মানসকে আমি পুরো ভড়কি দিইনি।

কয়েক বছর আগে লালুদার প্রোচনায় আমি আর একটি মেয়েকে অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। বেহালায় থাকে, পর্বত অভিযাত্রিনী রোহিণী সেনগুপ্ত। পরে অবশ্য তাঁর সঙ্গে আমাদের সকলেই ভাব হয়ে গেছে, অতি চমৎকার মেয়ে সে। প্রথম দিনই গিয়ে জেনেছিলাম, রোহিণীর স্বামী মারা গেছে কিছুদিন আগেই। সেদিন রোহিণীর মুখে যে ভাবটা দেখেছিলাম, শ্রেয়ার মুখেও যেন সেই রকম ভাব। হয়তো সবটাই আমার ভুল। শ্রেয়া সম্পর্কে ও রকম কিছু শুনিনি। কেবলে প্রমাণও পাইনি, নিছুক একটা ধারণা। সেই ধারণাটা জানাতে গিয়ে মানস সম্পর্কে একটা প্রমাণ পেয়ে গেলাম।

বাড়ি ফিরতেই বউদি বললো, তোমার দাদা তোমার জন্য বসে আছে। আজ সবাই একসঙ্গে বসে খাওয়া হবে

এই রে! দাদার সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাওয়াটা আমি সব সময় এড়িয়ে যাই। দাদা বাড়তে থাকলে আমি টুক করে মিজের খাওয়াটা সেরে নিই। আজ ধরা পড়ে গেছি। হৃত্য যখন হয়েছে, তখন মোগলের সাথে খানা খেতেই হবে। খানা খেতে খেতে অনেক উপদেশ শুনতে হবে। ধর্মক খেতে হবে।

কাল আবার একখানা খানা খেতে হবে তাঁজ বেঙ্গলে ধীরেন ধররের সঙ্গে। বোঝাইতে চাকরি পাবার জন্য ইন্টারভিউ। দাদা দেখছি আমাকে বাড়িছাড়া না করে ক্ষান্ত হবেনা।

হাত মুখ ধূয়ে, জামা টামা বদলে খাবার টেবিলে এসে দেখি দাদা সভাপতির চেয়ারটাতে আগে থেকেই বসে আছে। সামনে প্লেট সাজানো, এখনো খাওয়া শুরু করোনি। এক পাশে দুটি খাবারের প্যাকেট, তাতে ট্যাংবার এক চিনে রেন্ডেরাঁর নাম লেখা। দাদা মাঝে মাঝে ড্রফিস থেকে ফেরার পথে কিছু কিছু খাবার কিনে আনে। নিজের শখের খাবার। বছরে এ রকম মাত্র কয়েকদিনই হয়। যেদিন খাবার নিয়ে ফেরে, বোঝা যায়, সেদিন তার মেজাজ ভালো আছে।

কিন্তু আমি খাবারের প্যাকেট দুটি দেখে প্রমাদ শুনলাম আজ আমার কপালে দুর্ভোগ আছে।

দাদা প্রসন্নভাবে বললো, আয় নীলু রাত দশটা বেজে গেছে, খিদে পায়েরি? কাল যিঃ ধরের সঙ্গে তোর অ্যাপয়েন্টমেন্ট, মনে আছে তো? ও কিন্তু কাল বিকেলের ফ্লাইটে দিল্লি চলে থাবে।

আমি ঘাড় কাত করে বললাম, হ্যাঁ মনে আছে।

মা শয়ে পড়েছে, আমরা মাত্র তিনজন। এ বাড়ির নিয়ম হচ্ছে, বউদির পরিবেশন করা চলবে না। যে-যারটা নিয়ে নেবে, বউদিকেও প্রকল্পস থেতে বসতে হবে।

প্রথমে ভাত, মুসুরির ডাল, খিংড়ে পোক কুচিকুচি করে আলুভাজা। অতি উপাদেয়। বেগুন ভাজা হলে আরও একটু জমজম। আমার বেগুন ভাজার প্রতি দুর্বলতা বউদি জানে। বাড়তে নিশ্চয়ই বেগুন নেই।

ঝিঙ্গে-পোস্তাটা বউদি খুবি চমৎকার রাঁধে। গোলমালটা শুরু হলো, যখন আমি ঝিঙ্গে  
পেত দ্বিতীয়বার নিতে গেলাম।

দাদা বললো, অত ঝিঙ্গে-ফিঙ্গে থেয়ে পেট ভরাছিস কেন? তুই চিংড়ি ভালোবাসিস,  
আজ ট্যাংরা থেকে চিংড়ি ভাজা নিয়ে এসেছি, গোল্ড কয়েন, দারংগ ডিলিশাস।

আমি করুণ চোখে বউদির দিকে তাকালাম।

বউদি মাথা ঝাঁপিয়ে ইঙ্গিতে জানালো, তুমই বলো না।

আমি ভুরু তুলে বউদিকে বকুনি দিলাম।

বউদি দাদাকে বললো, এই যে শুনছো, নীলু আজ থেকে নিরামিষ খাবে ঠিক  
করেছে। ওবেলা মাছ খায়নি।

দাদার সামনে যেন একটা বোমা ফাটলো।

চোখ গোল করে, দারুণ অবাক হয়ে বললো, মাছ খায়নি? কেন? পেটের অসুখ  
হয়েছে?

আমি মিনমিন করে বলুনলাম, দাদা, আমি এখন থেকে নিরামিষ খাবো।

দাদা বিরাট আওয়াজ করে বললো, অ্যাঁ? কী বললি, নিরামিষ খাবি? কেন, তুই কি  
সাধু-সন্মিসী হতে চাস নাকি? বাঙালী সাধু-টাধুরা আমিষ খায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব মাছের  
বোল খেতেন।

এবার আমি একটু জোর দিয়ে বলুনলাম, সাধু হতে যাবো কেন? এমনিই নিরামিষ  
খাওয়া যায় না! অনেক লোক তো নিরামিষ খায়।

অনেক লোক খায় খাক, তুই কেন খাবি?

—আমি মানেকা গান্ধীর একটা প্রবন্ধ পড়েছি, আমরা অকারণে এত জীব হত্যা করি  
বলেই পৃথিবীতে এত যুদ্ধবিগ্রহ। নিরামিষ খেলে মাথা ঠান্ডা থাকে।

—সঞ্জয় গান্ধীর ঐ বাচ্চা বউটা কয়েকটা দিনের জন্য পরিবেশ মন্ত্রী হয়েছিল বলে  
সবজান্তা হয়ে গেছে? গাছপালার বুঝি প্রাণ নেই?

—আমরা গাছের ফল খাই, গাছটাকে তো মারি না।

—ইডিয়লের মতন কথা বলিস না। গাছ থেকে আম পাড়ার মতন বুঝি ধান থেকে  
ধান পাড়ে? ধান-গম-ডাল গাছ কেটে না ফেলে কে কবে। তার ফল পেয়েছে? মুর্গি  
পালনের সঙ্গে ধান চাষের তফাত কী আছে? নিরামিষ খেলে মাথা ঠান্ডা থাকে? হিটলার  
ছিল নিরামিশাষী। পৃথিবীর ইতিহাসে ও রকম লোক আর কেউ হয়েছে?

—হিটলার ব্যতিক্রম, তুমি মহাদ্বা গান্ধীর কথাও ভাবো।

—গান্ধী ও ব্যতিক্রম। গান্ধীর চেলারাই তো বেবি ফুড উধা ও করেছে বাজার থেকে,  
সরবরের তেলে ভেজাল মিশিয়েছে, গোটা কালো বাজারটা চালু রেখে কোটি কোটি  
মানুষের রক্ত চুমে থেয়েছে। এতে তর্ক করিস না, নীলু! ভালো চিংড়ি এনেছি, থেয়ে নে।

—আমি থেতে পারব না দাদা।

—তুই খাবি না?

—না!

নিজের মনের জোরে আমি নিজেই অবাক হয়ে যাইছি। নিরামিষ খাবার সিন্দ্রান্তটা  
নেবার পর থেকেই দাদার মুখের ওপর না বলাৰ সন্তুষ আমি সঞ্চয় করে ফেলেছি!

ব্যাসামা-ব্যাঙ্গমীর অন্য উপদেশগুলো মাঝতে পারি বা না পারি, এই নিরামিষের  
ব্যাপারটা আমাকে পরীক্ষা করে দেখতেই হবে।

দাদা দুটুকরো চিংড়ি ভাজা মুখে দিয়ে চিবুতে চিবুতে বললো, তা হলে তোর মতে এখন থেকে সকলেরই নিরামিষ খাওয়া উচিত?

আমি সম্মতিসূচক চুপ করে রাখলাম।

দাদা বললো, তা হলে পৃথিবীর অবস্থাটা কী হবে জানিস? মনে কর, আমাদের দেশেই এক কোটি পাঁচা আছে। তার অনেক বেশিই আছে। হিসেবের সুবিধের জন্য আমি ধরে নিছি এক কোটি। এর মধ্যে পঞ্চাশ লাখ ছেলে পাঁচা, পঞ্চাশ লাখ মেয়ে পাঁচা। বছরে ওদের গড়ে তিনটে বাচ্চা হয়। পঞ্চাশ লাখের দেড়কোটি বাচ্চা। আগেকার এক কোটি, অর্থাৎ একবছরে হলো আড়াই কোটি। পরের বছর সওয়া কোটি মেয়ে পাঁচার আবার তিনটে করে বাচ্চা, অর্থাৎ পৌনে চার কোটি প্লাস আড়াই কোটি। কত হলো? সওয়া ছ' আর কোটি এবার তার অর্ধেক মেয়ে পাঁচাৰ....

বউদি দুহাত তুলে বললো, ওরেৱ্বাৰা, থামো থামো, যাথা গুলিয়ে যাচ্ছে।

দাদা জুলত চোখে ধমক দিয়ে বললো, দাঁড়াও! এই মানেকা গাঙ্কীর নতুন চেলাটিকে আসল ছবিটা বুঝিয়ে দি। এরা প্রকৃতির নিয়ম উচ্চে দিতে চায়? পাঁচা-ফাঁচাদের সংখ্যা বাড়ে চক্ৰবৃক্ষি হয়ে। মোটে তিন বছরের হিসেব শুনলে! দশ বছরে সারা দেশটা পাঁচায় ভরে যাবে, এরা সমস্ত, খাস গাছপালা খেয়ে শেষ করে, জোর করে মানুষের বাগানে চুকে পড়বে, খিদের জুলায়। চতুর্দিকে ম্যাম্যা ম্যাম্যা ডাক শুনবে। গৱু-ওয়োৱের সংখ্যা ও বাড়বে, তারা ধান ও গম খেত শেষ করে দেবে, পৃথিবীর সব সবুজ নিষিহ করে দেবে। শহরের রাস্তাঘাটও ওৱা ভরিয়ে দেবে, গাঢ়ি চালানো যাবে না। পুকুর -নদীগুলো মাছে ভরে যাবে তাতেও আর নামা যাবে না, যাথার ওপৱ ফুর ফুর করে উড়ে যাবে হাঁস-মুর্গি....

বউদি দুহাতে কান চাপা দিয়ে বললো, থামো, থামো।

দাদা হা-হা করে তৃষ্ণির হাসি হাসলো। তারপর খাবারের প্যাকেটটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, নে পাগলামি করিস না, খা। তোর কথা ভেবেই এনেছি। চিংড়ি মাছ তো মাছ নয়। মাছও নয় মাংসও নয়। চিংড়ি একটা আলাদা জিনিস। খাদ্যের মধ্যে অনবন্দ্য। এর কোনো তুলনা নেই। নে, তুলে নে।

আমি চোয়াল শক্ত করে বললাম, না, দাদা, আমি খেতে পারবো না।

দাদা বললো, এর পরে চিলি চিকেন আছে, তুই তাও খাবি না? আর কী খাবি তা হলে?

আমি অন্য একটা বাটির ঢাকনা খুলে বললাম, এই তো খনিকটা কঢ়ান্তি শাক আছে। ও বেলা এটা আমার খুব ক্ষতিলো লেগেছিল। এটা আমি শেষ করে দিচ্ছি।

দাদা আর্তনাদ করে উঠলো, শাক? রাস্তিৱেলা? এই সব ঘাস পাতা কোনো মানুষ খায়?

নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে এসে আমার পিঠের কাছে দাঢ়িয়ে বললো, শ্যাখ মৈলু, অনেক ন্যাকামি হয়েছে, আমি আর সহ্য করবো না। এই বাটিটা আমি ছুড়ে ফেলে দেবো!

বউদি আমার পক্ষ নিয়ে বললো, ও যদি নিরামিষ খেতে চায়, তাতে তোমার এত আপত্তি কেন?

দাদা বললো, তুমি বুঝতে পারছো না ও আমাকে অপদস্থ করতে চায় ধীরেন ধরের সঙ্গে কথাবার্তা প্রায় ঠিক হয়ে আছে। কাহিতোজ বেঙ্গলে লাখও খেতে ডেকেছে, কত ভালো ভালো খাবার খেখানে গিয়ে ও বলবে, নিরামিষ? কলমি শাক চাই?

বউদি বললো, ঢাকৱির সঙ্গে কে কী খায়, তাও কী সম্পর্ক আছে?

দাদা বললো, তবু প্রথমেই যদি একটা ধারণা খারাপ হয়, মনে করে আনসম্ভার্ট....  
বউদি রীতিমতন প্রতিবাদের সুরে বললো, যারা নিরামিষ থায়, তাদের বুঝি চাকরি  
করার যোগ্যতা থাকে না। বশেতে চাকরি করতে গেলে মাছ-মাংস খেতেই হবে, মদ  
খেতে হবে।

দাদা অস্থিরভাবে দু'হাত নেড়ে বললো, আমি কী সে কথা বলেছি? তবু বাঙালীর  
ছেলে হঠাত যদি বলে...আমার ভাই রাস্তির বেলা গরুর মতন ঘ্যাস ঘ্যাস করে ঘাস-পাতা  
থাচ্ছে, এটা আমি চোখে দেখতে পারছি না, আমার গঃ জুলা করছে! দুর ছাই আমিও তা  
হলে আর কিছু খাবো না।

লোভনীয় চিংড়ি ভাজা ও পরবর্তী লংকা-মুর্গি ঠেলে ফেলে দিয়ে দাদা রাগ করে চলে  
গেল বাথরুমে।

## ॥ ৫ ॥

কী যেন একটা পাখি ডাকছে। ভারি মিষ্টি সুর।

চোখ মেলে দেখলাম, ঘরের মধ্যে অঙ্ককার, জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা চাপা  
আলোর রেখা। ক'টা বাজালো?

মুমু একটা অ্যালার্ম ঘড়ি দিয়ে গেছে, পৌনে পাঁচটায় সেটা বাজবার কথা। এখনই  
পাঁচটা বেজে দশ। অ্যালার্ম বেজেছে নিশ্চয়ই, তাতেও আমি জাগিনি। ঘুম ভাঙলো একটা  
পাখির ডাক শুনে। পাখিটাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত।

আন্তে আন্তে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। শরীরের জড়তা কাটছে না। গোটা  
দশকে বৈঠক দিয়ে নিলাম। তারপর উঁকি মারলাম জানালা দিয়ে।

নিচের কার্নিসে এক জোড়া পাখি বসে আছে। চমকে উঠলাম। সেই  
ব্যাঙমা-ব্যাঙমী নয় তো? ন, এ যেন এক জোড়া শালিক। এক এক সময় শালিকের  
ডাকও মধুর শোনায়। তবু নিঃশব্দে অপেক্ষা করলাম একটুক্ষণ, ওরা কথা বলে কিনা  
দেখবার জন্য।

নাঃ নিছকই শালিক। শালিক যখন উড়ে থায়, তখন একটু শুক ফেলে রোঁ যায়।

বাথরুমে চোখে দু'বার মাত্র জলের ছিটে দিতেই পেট্টা গুলিয়ে উঠলো পেটের  
মধ্যে কোনো একটা সাঙঘাতিক প্রাণী যেন ঢুকে বসে হাঁট হাঁট করে আমার নাড়িভুঁড়ি  
কামড়াচ্ছে।

আর কিছু ভাববার আগেই শুরু হয়ে গেল বমি।

বাড়িতে আর কেউ জাগেনি, চেষ্টা করলাম যতদূর সত্ত্ব শব্দ না করে। রুমিটা সেরে  
ফেলার, কিন্তু এটা তৈরি আর চেষ্টার ওপর নির্ভর করে না। মায়ির সহজে লা দিয়ে একটা  
অত্তুত শব্দ বেরবেই।

এ শব্দ মায়ের ঠিক শুনতে পায়।

যা ঢুটে এসে জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে, কী হয়েছে শালিক?

আমি কোনোক্ষমে মাথা নেড়ে বললাম, কিছু হ্যান্ট করে কিছু না!

আবার বমিতে বেসিন ভরে গেল, আবার ভরে।

যা দোড়ে একটা কাঁসার গেলাসে খালিকটা সুন-জল নিয়ে এসে বললো, এটা একটু  
একটু চুমুক দে তো!

কিন্তু এ নুন-জলে কমার ব্যাপার নয়! পেট মুচড়ে বমির ভাব আসছে। বমি আর বিশেষ বেরগতে চাইছিল না।

মুখ ধূয়ে বিছানায় ফিরে এসে শয়ে পড়লাম।

মা এবার নিয়ে এলো তার নিজের ওষুধ স্টমাক কিওর।

কাপে করে সেটা খাওয়াতে মৃদু উৎসনার সুরে বলতে লাগলো, নিশ্চয়ই কোনো দোকান-টোকানে চপ-কাটলেট খেয়েছিস। গরমের সময় ওগুলো ভালো না। একটু আগে অ্যালার্ম বাজালো কেন। এত সাত-সকালে কোথায় যাস। না, না, আজ আর কোথাও যেতে হবে না।

মায়ের ওষুধটা খেয়ে আমার ব্যথাটা একটু কমেই আবার দ্বিগুণ বেড়ে গেল। আমি গড়াগড়ি দিতে লাগলাম। বিছানায়। মুখ দিয়ে আঃ আঃ শব্দ বেরিয়ে আসতেই, সেটা চাপতে পারছি না কিছুতে।

এবার মা ভয় পেয়ে দাদাকে ডেকে তুললো।

কঁচা ঘুম ভাঙলে দাদার মেজাজ খুব খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু মাকে যে বাধা দেবো, গলা দিয়ে হ্রস্ব ফুটছে না।

মা আর বউদি উদ্বেগ-বিহুল মুখে বসলো আমার মাথার দু'পাশে।

কোমরে দু'হাত দিয়ে দাদা গঁট হয়ে দাঁড়ালো ঘরের মাঝখানে। যেন জিঘাংসা প্রবৃত্তি নিয়ে বললো, কলমি শাক। খা আরও বাটি বাটি কলমি থাক। যা গরুর খাদ, তা কখনো মানুষের সহ্য হয়?

তারপর বউদির চোখে চোখ রেখে বললো, তোমারই তো দোষ। তুমি অত্থানি খেতে দিলে।

বউদি বললো, বাঃ আমি কী করবো? ও খেতে চাইলো।

দাদা বললো, তুমই তো কাল ওকে খুব সাপোর্ট করলে। আমি যেন বাজে কথা বলি। অত দাম দিয়ে চিংড়ি কিনে আনলাম।

মা বললো, হ্যাঁ রে, ও যে খুব কষ্ট পাচ্ছে। ডাক্তার ডাকবি না?

আমি কোনো ক্রমে মাথা নেড়ে বললাম, দরকার নেই, দরকার নেই।

দাদা! বিরক্তিভাবে বললো, এত সকালে ডাক্তার কোথায় পাবো? কোনো ওষুধের দোকানও খোলেনি।

বউদি বললো, তোমার বক্সু, ডষ্টের ব্যানার্জি, তাঁকে একবার খবর দিলে হয় না?

দাদা বললো, দ্যখো, ডাক্তার যদি বক্সুও হয়, তাকে যখন তখন বিরক্তি করা চলে না। ডাক্তারদের ও তো একটা নিজস্ব জীবন আছে।

বউদি বললো, যদি সিরিয়াস কিছু হয়, জানো, আমার এক মামাতো ভাই, তার হঠাৎ অ্যাপেনডিস ফেটে গিয়েছিন, তারপর প্রাণ নিয়ে টানটানি।

মা ঝংকার দিয়ে প্রতিবাদ করে বললো, ওসব আকথা-কুকথা বলো না তো বৌমা। নীলুর সে রকম কিছু হয়নি।

তারপর আমার মাথায় হাত বুলিয়ে, বললো, কী রে, সৈন্ধু, তোর খুব কষ্ট হচ্ছে? একটু কি কমেছে?

এই দুটো প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে বলতে হয়, নাকে হ্যাঁ। আমি উ উ বললাম।

দাদা বললো, আর দু'-একবার বমি করলেই ঠিক হয়ে যাবে।

তারপর কিছু একটা অস্বস্তিতে ঘরের মধ্যে দ্বিতীয়বার পায়চারি করে দাদা আমার মুখের সংমনে দাঁড়ালো। কিছু বলতে চায়, বলতে পারছে না।

এক মিনিট বাদে বলেই ফেললো ।

গলার স্বর নরম হওয়ে জিজ্ঞেস করলো, হ্যারে, নীলু, দুপুরে মিঃ ধরের সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারবি তো তাজ বেঙ্গলে?

আমি কিছু বলার আগেই মা বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ পারবে। অনেকখানি বমি হয়ে গেছে আমি দেখছি। রক্ত-টক্ট পড়েনি। ব্যাথ্যাটা আস্তে আস্তে কমে যাবে ঠিক। যেতে হবে তো সেই দুপুরে। আর একবার ষষ্ঠাক কিওর খাইয়ে দেবো।

হায় রে চাকরি! মধ্যবিত্ত পরিবারে একটা চাকরি স্থাকুর-দেবতার চেয়েও বেশি আরাধ্য। চাকরির একটা সম্ভাবনার কথা শুনলে মাত্মেহ, ভাত্মেহও উপে যায়। চাকরি সর্বরোগহর ওষুধ। সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অবদান এই চাকরি। যে চাকরি পায় না, সে এক অতি হতভাগ্য, সমাজের কলঙ্ক।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ, পারবো। যাবো।

দাদা আবার বললো একলা যেতে পারবি না তোর বউদি পৌছে দেবে? অবশ্য ওখানে অন্য কারুর সঙ্গে যাওয়াটা ভালো দেখায় না।

আমি আবার মিনমিন করে বললাম, একাই পারবো। একটু শুয়ে থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে।

এরপর আর মাত্র দু'বার বমি হলো। মা এবং বউদি খুব আঘাতের সঙ্গে দেখে গেল, সেই বমিতে রক্তের ছিটে আছে কি না। না, রক্ত-টক্ট নেই, নিশ্চিত।

অফিস যাবার আগে দাদা আমাকে আর একবার দেখে গেল। কপালে হাত দিয়ে বললো, জুর-টুর তো নেই দেখছি।

অর্থাৎ জুরই যেন অসুখের একমাত্র লক্ষণ। জুর না থাকলে উদ্ধিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই। বমি আর পেট ব্যথা অতি সামান্য ব্যাপার, কত লোকেরই তো ওরকম হয়।

অফিস যাবার পথে দাদা তাঁর বক্স ডাঙ্কার ব্যানার্জিকে একটা খবর দিয়ে গেলেন। যাতে তিনি কড়া কোনো ওষুধ দিয়ে আমাকে অবিলম্বে চাঙ্গা করে দিতে পারেন।

ডাঙ্কার ব্যানার্জি তাঁর চেম্বার সেরে আমাকে দেখতে এলেন বেলা এগারোটার সময়। তিনি দীর্ঘকায় পুরুষ, অতি সুরসিক। আমাকে তিনি চেনেন অনেক ছোটবেলা থেকেই। আমি তাঁকে শ্রবন্দা বলে ডাকি।

দরজা দিয়ে চুকতে চুকতেই তিনি বললেন, কী ব্যাপার, টো-টো কম্পানির ম্যানেজার, বাউন্সলেদের যুবরাজ নীললোহিত বিছানায় শুয়ে কেন? এ তো মোটেই মানায় না। কী হয়েছে তোমাদের?

আমি বললাম, সে রকম কিছুই হয়নি। আপনি শুধু শুধু কষ্ট করে এলেন।

ডাঙ্কার ব্যানার্জি বললেন, হ্যাঁ, খুবই কষ্ট হয়েছে তোমাদের বাড়িতে এলে তিনতলা সিঁড়ি ভাঙতে হয়। দেখি, কিংতু দেখি।

মা বললো ভোর বেলা থেকেই ওর বমি হয়েছে বেশ কয়েকবার। সেই সঙ্গে পেট ব্যথার কথা বলছিল। এখন অবশ্য এক ঘণ্টার মধ্যে বমি হয়নি।

ডাঙ্কার ব্যানার্জি বললেন, বমির সঙ্গে পেট ব্যথা? ভাঙ্গে কথা নয়। বমির রং কী? কালো, না হলদে?

মা বললেন, সবুজ সবুজই তো মনে হলো?

—চিংড়ি মাছ খেয়েছে ক'টা? কিংবা ইলিশ?

বউদি বললো, না, না, কাল মাছ-মাংস কিছুই খায়নি। কলমি শাক খেয়েছে অনেকটা।

ডাঙ্কার ব্যানার্জি চোখ বড় বড় করে বললেন, আঁ? এই গরমকালে কলমি শাক কি মানুষে থাই? তা হলে গুরু-ছাগলরা যে না খেয়ে মরবে। কী সাংগৃতিক কথা। হঠাৎ কলমি শাক খেতে গেলে কেন?

বউদি বললো, আমরা তো সবাই থাই। ও একটু বেশি খেয়েছে।

ডাঙ্কার ব্যানার্জি আমরা গেঞ্জি তুলে পেটটা টিপতে টিপতে বললেন, ওহে মীলুচন্দৰ, অনেক দিন তোমায় কলকাতায় দেখছি। জঙ্গল তোমায় ডাকাডাকি করছে না? তুমি কত অজানা জায়গায়, বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াও, তোমাকে আমাদের হিংসে হয়। আমরা তো সময়ই পাই না, এমন বাঁধা পড়ে শোঁছি!

এই ধরনের কথাবার্তা মা-বউদিদের ঠিক পছন্দ হলো না।

মা বললো, আজ দুপুরেই ওর একটা চাকুরির ইন্টারভিউ দেবার কথা। বোঝাইতে ভালো চাকরি পেতে পারে—

ডাঙ্কার ব্যানার্জি বললেন, বোঝাই! আমাদের মীলু বষে চলে যাবে? তা হলে কলকাতার চাকা উল্টো দিকে ঘোরাবে কে? বুঝলেন মাসিমা, সবাই যদি কাজ করে, সবাই যদি চাকরি-বাকরি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তা হলে বাঁশি বাজাবে কে? কবিতা লিখবে কে? গান গাইবে, ছবি আঁকবে কে? গাদা-গুচ্ছের কেজো মানুষের ভিড়ে এই রকম দু'চারজন উল্টো স্নাতে থায়, তাতেই তো এত বড় শহরের নার্ত একটু ঠাণ্ডা হয়।

মা অপ্রসন্ন মুখে বললো, ওসে তো চাকরি-বাকরি করেও করা যায়। একটা ছেলের পের পুরো সংস্থারের ভাই, মীলু যদি কিছু একটা কাঙ্গ পায়, তাতে খানিকটা সুরাহা হয়।

ডাঙ্কার ব্যানার্জি সঙ্গে সঙ্গে মায়ের কথা মেনে নিয়ে বললেন, তা অবশ্যই ঠিক। মীলুকেও ধৰেবেঁধে একটা চাকরির হালে জুড়ে দেওয়া দরক়ার। বোঝাই কেন, ওকে চেরাপুঞ্জি কিংবা ভাবখায়নকেও পাঠানো যেতে পারে। ও যখন-তখন হটহাট করে জঙ্গলে গিয়ে ঘুরে বেড়াবে, কিংবা একটা পাহাড়ী নদীর ধারে গিয়ে বসে থাকবে, অথচ আমরা তা পারবো না, এ আর কতদিন সহা করা যায়—

আমি বঙ্গলাম, ধূঢ়বন্দা, আজ কেল! একটা সময় ভাজ বেঙ্গল হোটেলে আমার একটা লাক্ষণের নেচুলুচু চ চাকরির ইন্টারভিউ আছে। আর বেশি দেশি করা যাবে না। আমি এবার উঠে পাড়ি পেট ব্যথা অনেক করে গেছে

ডাঙ্কার ব্যানার্জি দারণ চমকে উঠে বললেন, ওরে বাবা, ফাইভ স্টার হোটেলে লাখ, সেই সঙ্গে ইন্টারভিউ? মীলু যে ভিঅই পি! এরকম সৌভাগ্য ক'জনের হয়! তা তোমার বদলে আমি ইন্টারভিউ দিতে গেলে চলে না! বেশ ভালো-মন্দ খাওয়া হবে! সত্যি, শুনে আমারই লোভ হচ্ছে।

তায়পর মায়ের দিকে ফিরে হঠাৎ কড়া গলায় বললেন, শনুন, মাসিমা, এই অবস্থায় মীলু ইন্টারভিউ দিতে বাইরে যদি তেবিলেই বর্ম করে কেনে, সেটা বি খুব ভালো হবে! হঠাৎ পেটের ব্যন্ত্রনাম অঙ্গুশ হয়েও যেতে পারে। সে সজ্জনা আছেই। ওর কিডনিতে স্টোন হয়েছে কিনা। সেটা পরীক্ষ করে দেখতে হবে। কোনোগুফি করা দরকার। তার আগে ইউরিন টেস্ট, রাড টেস্ট.. আমি গোক পাঠাইয়ে দেবো। অজ্ঞ সারদিনে ও শপু বাথরুমে যাওয়া হাড়া বাইরে এক পাও বাড়াবে না। চাকরি তো আর দুব ফুরিয়ে যাচ্ছে না, এর পরেও ও অনেক সুবোগ পাবে। আমি রঞ্জনকে অফিসে ফোন করে। জানিয়ে দিচ্ছি।

উঠে দাঁড়িয়ে তিনি মুচকি হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ঘাবড়ও না, মীলু, চিয়ার আপ। কিডনিতে পাথর হলেই দ্বা কী, পেট কেটে বার করে দেওয়া হবে, তোমার বউদি সেই পাথর দ্বিতীয় আঙ্গটি বানাবে।

বউদির দিকে ভ্রুকুটি করে বললেন, ফি তো তোমরা দাওই না, এক কাপ চা খেতেও বললে না।

ব্যস এর পর আমি সারাদিন বাড়িতে শয্যাবন্দী। ইন্টারভিউ দিতে যাবার প্রশ্নই ওঠে। না। ডাঙ্গার ব্যানার্জির পরামর্শ অগ্রহ্য করার মতন সৎসাহস দাদারও নেই।

মা আর বউদি চলে গেল আমি শুয়ে রইলাম একা। আজ অনেক বই পড়া যাবে। মাঝে মাঝে অসুখ আমার ভালোই লাগে। মন দিয়ে পড়াঙ্গনো করা যায়। তবে, পেট-ব্যাথার চেয়ে জ্বর অনেক বেশি উপভোগ্য। জ্বরে বেশ একটা মেশা মেশা ভাব হয়। একশো চারের বেশি উঠে গেলে তো চমৎকার।

কেউ যদি মনে করে যে, আমি ইচ্ছে করে গলায় আঙুল দিয়ে বমি করেছি আর পেট ব্যাথার ভান করেছি, আমার আজকের অসুবিধের ব্যাপারটা পুরোটাই মিথ্যে, তা হলে খুবই ভুল হবে। নীললোহিত কঙ্গনো নিজের সম্পর্কে মিথ্যে কথা বলে না; আমি অনেক সময় গল্প বানাই বটে কিন্তু সে তো কল্পনার বিস্তার।

মিথ্যে আর কল্পনা মোটেই এক নয়।

আসল ব্যাপার হচ্ছে ইচ্ছাক্ষি। আমি তীব্রভাবে চেয়েছিলাম, আজি সকালটা বিছানায় শুয়ে থাকতে। অত বড় এক বাটি ভর্তি কলমি শাক রাস্তির বেলা থেয়ে ফেলার মুরোদ ক'জনের আছে? আমি সোনা মুখ করে খেয়েছি। তার একটা ফল পাওয়া যাবে না? বমিটা সত্যি, পেট ব্যাথাটাও সত্যি।

তা ছাড়া একজন ডাঙ্গার এসে আমাকে জোর করে বিশ্রাম নিতে বলে গেলেন, আমি তো তাঁকে কিছু শিখিয়ে দিইনি।

আরও একটা সত্যি কথা এই যে, দুপুরবেলা তাজ বেঙ্গলে যাবার ব্যাপারে আমার কোনো আপত্তি ছিল না। ধরবাবুকে একটু বাজিয়ে দেখার ইচ্ছে ছিল বরং। ইন্টারভিউ দিতে আমি ভয় পাই না। দিনে দিনে আমার সাহস বেড়েছে। এখন ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে আমি চাকরি-দাতাকেই জেরা করতে শুরু করি। সেটা বেশ মজার ব্যাপার হয়।

আসলে ভোরবেলা মুমুক্ষে ঘোড়ায় চড়া শেখানোর জন্য নিয়ে যেতেই আমার আর ইচ্ছে করছিল না। অত সকালে মুমুর সঙ্গে কোথাও বেড়াতে যাওয়া আমার পক্ষে কত আনন্দের বিষয় হতে পারত। কিন্তু ময়দানে ভিজে আর আনুপম নামে দুই মৃত্তিমান আজও এসে উদয় হত নিশ্চয়ই।

কাল মুমু ওদের সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করছিল, সেই কথা ভাবতেই আমার বুক জুলে যাচ্ছে। কেন ওরা আসবে? অথচ মুমুর ওদেরই চায়!

এ এক অসম প্রতিযোগিতা! ওদের দু'জনেরই বয়েস মুমুর কাছাকাছি সুতরাং ওদেরই অর্কার বেশি। আমি শিখত্বী, আমি মুমুয়ে কর্ণি সেজে দুরে ছেন্টিয়ে থাকবো ভ্যাবাগঙ্গারামের মতন। ওরা যে-সব বিষয়ে কথা বলবে, আমি তাতে স্পষ্ট দিতে পারবো না আমি মুমুকে যে কী ঞ্চন্দ ভালোবাসি, তার মর্ম ওই দুটি ছেলে~~কেব~~বে না কথনও।

মুমু বিশ্চয়ই ভোর বেলা অনেকক্ষণ ছটফট করেছে অন্ধকারে শেখ পর্যন্ত কি ও একাই চলে গেল ময়দানে? নাঃ, তা বোধ হয় সম্ভব নয়। চক্রবৰ্দির নিশ্চয়ই নিষেধ আছে।

ভালোই হলো। আমি কেন গেলাম না আজ, ~~অন্ধকারে~~ অবশ্যই তা জানতে আসবে। এসে আমাকে বকুলি-বকুনি দেবে। ক্ষুল ফেরত অন্ধকারে পারে। যতই রাগারাগি করুক, আমি মুমুর হাত ধরে গন্ধ শুকবো। ওকে বসাবে আমার শিয়রের কাছে। একবার মাথা রাখবো ওর উরত্তে। মুমু কি আমার চুলৈ বিলি কেটে দেবে নাঃ?

একটু বাদে বউদি এলো ঘরে, হাতে একটা কাপ। জিজ্ঞেস করলো, তুমি কী খাবে, নীলু? ডাক্তার তো বলে গেলেন, শক্ত খাবারের বদলে তোমাকে আজ পাতলা কিছু দিলেই ভালো হয়।

বেশি খিদে খিদে পাছে। সকাল থেকে তো কিছুই পেটে পড়েনি, বেরিয়ে গেছে অনেক কিছু। খিদে পাওয়া মানেই অসুখের পলায়ন।

আমি বললাম, তোমার হাতে ওটা কী? চা?

বউদি আমতা আমতা করে বললো, না, এটা একটু চিকেন সুপ বানিয়েছি। জানি না কেমন হয়েছে। আগে তুমি আমার সব রান্না চেখে দেখতে। এখন তুমি তো এসব খাবে না।

আমি হাত বাড়িয়ে বললাম, দাও।

মহাশ্বা গাঙ্কী লেবুর শরবত খেয়ে অনশন ভঙ্গ করতেন, আমার নিরামিষ ব্রত ভঙ্গ হলো চিকেন সুপ দিয়ে।

দু' চুমুক দিয়ে আমি বললাম, উ-ম-ম বেশ হয়েছে। আর একটু দাও। তোমাদের কম পড়ে যাবে না তো?

এর পরে মা এসে পাশে বসে বললো, আর এত অনিয়ম করিস না, নীলু! কেন এখানে-সেকানে ঘুরে বেড়াস? বোঝাইতে চাকরি করতে যাওয়াটা আমারও পছন্দ ছিল না। সেখানে যাবার পর যদি তোর এই অসুখ হত? ঠাকুর বাঁচিয়েছেন। কিডনিতে পাথর, কী সাংঘাতিক কথা।

আমি বললাম, মা, বোঝাই খুব ভালো জায়গা। ওখানে অনেক বড় বড় ডাক্তার আছে।

মা বললেন, থাকুক ডাক্তার! ওখানে তোকে দেখাণনো করত কে?

মিটে গেল সব ঝামেলা। অল কোয়ায়েট অন দা ওয়েষ্টার্ন ফ্রন্ট!

বিকেল গড়িয়ে সক্ষে হয়ে গেল, বিভুতিভূমণ বক্সোপাধ্যায়ের এগারোখানা ছোট গল্প পড়ে শেষ করলাম, তবু মুমু এলো না, এক মিনিটও ঘুমোইনি, যাতে মুমু এসে ফিরে না যায়।

মুমুর বদলে এলো মানস।

উক্তোখুক্তো চেহারা, যেন দুশো মাইল বেগে বয়ে যাওয়া বড়ের মধ্য দিয়ে ও হেঁটে এসেছে। চোখ দুটি বেশ জ্বলজ্বলে। যেন একটা ঘোরের মধ্যে আছে।

একটা চেয়ার টেনে আমার বিছানার পাশে বসে ফিসফিস করে বললো, নীলু, আজ একটা সাংঘাতিক ক্ষান্ত হয়েছে!

আমি কাত হয়ে উদ্বিগ্নভাবে তাকিয়ে রইলাম।

মানস বললো, আজ, বুঝলি, আজ লিফটে, আরও অনেক লোক ছিল, শ্রেয়া শুধু আমার দিকেই তাকিয়ে হেসে বললো-নমস্কার, ভালো আছেন?

যাঃ বাবা! একটা মেয়ে লিফ্টে বারোয়ারি ভিড়ের মধ্যে যাঁক্তি তিনটি শব্দের একটি বাক্য বলেছে, সেটাই হয়ে গেল সাংঘাতিক ব্যাপার?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কতটা হেসেছিল, আধখন মা পুরো?

— তুই ঠাট্টা করছিস? ব্যাপারটা সিরিয়াস ছেড়ে বছর ধরে ত্রি লিফ্টে আমাকে দেখছে, কোনোদিন আমার দিকে সরাসরি তারফ্যনি পর্যন্ত, হঠাৎ আজই আমার সঙ্গে কথা বললো কেন? ও কি তোকে চিনতে পেরেছিল, নীলু?

—আমাকে? কী করে চিনবে? আমাকে কখনও দেখেইনি!

—সেদিন রেঙ্গোরাঁয় দোতলায় আমরা ছিলাম। এক টেবিলে তুই আর আমি। নিশ্চয়ই লক্ষ করেছে। মেয়েরা কারুর দিকে না তাকিয়েও তাকে দেখতে পায়, তা জানিস তো? ওদের পিঠের দিকেও চোখ থাকে। ঠিক চিনে রেখেছে। তারপর চন্দননগরের ট্রেনে তোকে দেখেছে, তুই রিঞ্জায় ওকে ফলো করেছিস, তাতেই দুই আর দুই চারে মিলিয়ে নিয়েছে।

—তা যদি হয় তো ভালোই। মেয়েটা রাগ করেনি। খুশিই হয়েছে বোঝা যায়।

—ঠিক বলা যায় না। মেয়েরা হাসি হাসি মুখে অনেক কঠিন কথা বলে ফেলতে পারে। হয়তো, ওর পরেই বলত, আপনি আমার পেছনে লোক লাগিয়েছেন কেন?

শ্রেয়া নমস্কার করার পর তুই কী বললি?

—শুধু বললাম, হ্যাঁ ভালো! আর কিছু না। ঐ যে ধর্মকানির ভয় পেলাম। তা ছাড়া আমার ফোর এসে গেল, নেমে পড়লাম টপ করে।

—ক্যাবলাকান্ত আর কাকে বলে! তোর দ্বারা প্রেম হবে না। তুই কাগজে বিজ্ঞাপন দে।

—আমার কী করা উচিত ছিল, বল?

—আমি যদি মানস হতাম, তা হলে যেয়েটি ঐ কথা বলার পর আমি নিজের ফোরে নামতামই না। শ্রেয়া যেখানে নামে, সেই পর্যন্ত চলে যেতাম।

—আমার অফিসে দেরি হয়ে যেত যে?

—ধ্যাং তেরি! দু'পাঁচ মিনিট দেরিতে কী হয়? আমি ওর সঙ্গে নেমে বলতাম, এই যাঃ! আপনাকে দেখে আমি নিজের অফিসটাই ভুলে গেছি।

—এ কথা শুনে যদি ধর্মকান্ত? যদি বলত...

—মেয়েরা প্রথমে ধর্মকালেও পরে খুব ভাব হয়ে যায়— শ্রেয়াকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেওয়া যেত যে মানস রায়বর্মণ তার সম্পর্কে উৎসাহী। তারপর তোর মামারা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যেত! হেস্তনেস্ত হয়ে যেত একটা কিছু!

—বাড়িতে এখনও কিছু বলিনি। কাল সারা রাত ভালো করে ঘুমোতে পারিনি, বুঝলি! মাথার মধ্যে ঐ কথাটাই ঘুরেছে। ঐ যে তুই যা বললি কাল। যদি বিধবা কিংবা ডিভোর্স হয়..। আজ লিফ্টে ওকে প্রথম দেখে বুকের মধ্যে কাঁপুনিটা অন্য দিনের চেয়ে একটু কম হলো। শ্রেয়ার দিকে তাকিয়ে বারবার মনে হতে লাগলো, বিধবা? ডিভোর্স? নীলু বোধ হয় মিথ্যে বলেনি। মুখের মধ্যে একটু একটু যেন সেরকম ভাব আছে। বিধবা হলে তবু চলে, কিন্তু ডিভোর্স, না, না।

—বিধবা আর ডিভোর্সতে তফাত কী?

—বিধবা হলেও, তবু মানে, সব চুকেবুকে আছে। আর ডিভোর্স... আগের স্বামীটা ঘুরে বেড়াচ্ছে কোথাও, সে যদি গুণ্ডা হয়, আমার ওপর তুমি খুব রাগ থাকবে, যদি কোনো দিন হামলা করতে আসে, রাত্তিরবেলো হয়তো ছান্দোগ্যে চলে এলো—

— খুব হিন্দি সিনেমা দেখিস বুঝি? শোম্বুঝানস, আমি তো পরে তোকে বলেই দিয়েছি বিধবা কিংবা বিয়ে-ভাঙ্গার ব্যাপারটা আমার সম্পূর্ণ বানানো। ওর কোনো প্রমাণ

পাইনি, কেউ ওরকম কথা বলেওনি। তোর মামারা গেলে তো সব জেনেই যাবে। আগে থেকেই অত চিন্তা করছিস কেন?

—চিন্তা করবো না বলছিস?

—চিন্তা ছাড়া মানুষ বাঁচে না। ওসব কুচিন্তা হেড়ে ভালো কথা চিন্তা কর।

—তোকে আর একটা কথা বলবো, শীলু? তুই কিছু মনে করবি না? আমার মনে যা এসেছে, সেটা তোকে ফ্র্যাংকল বলতে চাই।

—আমার সামনে কিন্তু কিন্তু করছিস কেন? কী ব্যাপার!

—না, মানে, শ্রেয়া এতদিন পর আজই প্রথম আমার সঙ্গে নিজে থেকে কথা বললো তো? তোর জন্যই তো। তুই ওকে ফলো করেছিলি, ও তোকে চিরতে পেরেছে। বঙ্গুর জন্য তো কেউ কোনো ময়েকে ফলো করে না, নিজের জন্যই করে। ও বোধ হয় সেরকই ভেবেছে। ও হয়তো তোর সম্পর্কেই কিছু জানবার জন্য আজ আমাকে—

—তোর কি মাঝা খারাপ হয়েছে, মানস? এর মধ্যে আমি এলাম কোথা থেকে? তোর চেহারা সুন্দর, তুই একেবারে আদর্শ পাত্র, ভালো চাকরি, নিজেদের বাড়ি... হঠাৎ মেয়েটা আমার কথা ভাবতে যাবে কেন?

—মেয়েরা অনেক সময় গেরস্ত, কেরিয়ারিস্ট ছেলেদের চেয়ে বকাটে, বাউগুলে টাইপের ছেলেদের বেশি পছন্দ করে!

—বকাটে শব্দটায় আমি আপনি জানাচ্ছি। আর বাউগুলে কথাটা কি আমার গায়ে লেখা আছে নাকি?

—তোকে দেখলেই অনেকটা বোবা যায়। জামার বোতাম লাগাস না। ভেতরে গেঞ্জি নেই। জুলপি বড় রেখেছিস। যাই হোক, কতাটা যখন আমার মনে খচখচ করছে, তাই তোকে বলেই ফেললাম। তোকে একটা অনুরোধ করবো? এটা তোকে রাখতেই হবে। তুই এর মধ্যে আর আমাদের অফিসে আসিস না। শ্রেয়া তোকে চিনে ফেলুক, এটা আমি চাই না। আমার মামারা গিয়ে দেখাটেখা করুক। ব্যাপারটা কী দাঁড়ায় আমি বুঝে নিই, এই ক'টা দিন তুই আড়ালে থাক।

—ঠিক আছে ভাই, আমি প্রতিজ্ঞা করছি তোমার বিয়ের আগে আমি আর এক দিনও তোমার অফিসে যাবো না। যদি চাস তো তোর বিয়েতেও নেমতন্ত্র খেতে যাবো না!

—না, না, অতটা বলছি না, অতটা বলছি না! আমার বিয়েতে তুই আসবি না, তা কখনও হতে পারে?

যানসের মুখের ছাই ছাই রংটা কেটে গিয়ে আবার উজ্জ্বলতা ফিরে এসেছে।

এর পর আর বেশি কথা বলতালো একটু পরেই ঢলে গেল।

আমি যে কেন সংকেবেলো ওয়ে আছি, আমার যে কিছু অসুবিধে হতে পারে, সে সম্পর্কে কোনো কৌতুহলই দেখালো না। প্রেমে পড়লে বুঝি এক্ষণ্মৈ হয়। এ যে কথায় বলে না, প্রেম অক্ষ! এই অক্ষ চোখ নিয়ে রাস্তা-ঘাটে সমাজের করতে গিয়ে ও না গাড়ি চাপা পড়ে!

যাবার সময় মানস আমাকে একটা সান্তুন্দন দিলেন।

যদি জানা যায় যে শ্রেয়া মেয়েটির আগে একটা বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু বিধবা নয়, বিবাহ-বিচ্ছিন্না, তাহলে তো মানস ওকে বিয়ে করছেই না, তখন আমি যতবার ইচ্ছে

শ্রেয়াকে চন্দননগরের টেমে ফলো করতে পারি ! তখন শ্রেয়ার সঙ্গে আমি প্রেম করলেও  
ওর আপন্তি নেই ।

অর্থাৎ, মানসের ধারণা অনুযায়ী শ্রেয়ার আগেকার স্বামী যদি শুণা ধরনের হয়, এবং  
আমি তার প্রাঞ্জন পত্নীর সঙ্গে প্রেম করছি দেখে সে যদি আমায় মারধর করে, তাতেও  
ওর কিছু আসে যায় না !

মুমু এলো না, মুমু এলো না, আমাকে সে বকুনি দিতেও এলো না !

## ॥ ৬ ॥

ডাঙুর ব্যানার্জি পরদিনই জানিয়ে দিলেন, আমার রক্ত নির্দোষ, আর ইয়ে, মানে,  
(এটা ইংরিজিতে বললেই ভালো শোনায়) ইউরিনও নির্মল । পেটের ছবিতে পাথর-টাথর  
কিছু নেই । কলমি শাকই যত নষ্টের গোড়া । ব্যাঙ্গাম-ব্যাঙ্গমীকে দোষ দিয়েও লাভ নেই.  
তারা তো আমাকে নিরামিষের নামে বাটি বাটি ভর্তি কলমি শাক খেতে বলেনি ! নিরামিষ  
আমার ধাতে সয় না । তবু ভেজাল-নিরামিষের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে । ডিমসেক্টাকে  
আমিষের মধ্যে ধরা উচিত নহ । মাংসের বদলে শুধু সুপ । দাদা ঠিকই বলেছিল, চিংড়ি  
মাছ তো ঠিক মাছ নয় এক ধরনের জলের পোকা । পুরুরের ধারে কলমি শাক হয়,  
পুরুরের জলে চিংড়ি, দুটোরই প্রাণ আছে । দইয়ের মধ্যে আমরা কত খাই, তার কি ঠিক  
আছে? দুধের মধ্যে পোকা জমলেই তো দই হয় ।

সেদিন ঐ ট্যাংরার চিংড়ি মাছ ভাজাগুলোকে অস্থায় করাই আমার ভুল হয়েছে !  
এরপর আর বাড়ি থেকে বেরতে আমার কোনো বাধা থাকতে পারে না ।

কোথায় যাবো?

যাবার তো অনেক জায়গা আছ, কিন্তু একটা বাড়িই আমাকে চুম্বকের মতৰ টানছে ।

পর পর দুর্দিন মুমু কেন আমার খোঁজ নিতে এলো না, এটাই যেন একটা ধাঁধা ।  
প্রথম দিনের পর, মুমুর বাড়ি থেকে আমি ডেকে নিয়ে যাবো তোরবেলা, এরকমই কথা  
দেওয়া ছিল । অথচ আমি যাইনি, কেন যাইনি, তা জানতেও চাইলো না মুমু ? ওর তো  
এরকম স্বভাব নয় !

সারাদিন ঘুরে বেড়ালাম এদিক ওদিক । প্রীতমের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় ওর ছবির  
অ্যালবামে প্রায় 'শ' যানেক ফটোগ্রাফ দেখতে হলো । সেই সঙ্গে শুনতে হলো ওর  
চালিয়াতি কথাবার্তা । অজকাল এক একখানা ছবি তোলার জন্য ও নাকি পাচশো টাকা  
করে পায় । কী সুরঞ্জ ব্যাপার ! শিগগিরই ও গড়ি কিনছে । অথচ এই প্রীতম মাত্র করে  
বছর আগেও আমার কাছ থেকে কৃতবায় দু' টাকা-চার টাকা ধার নিয়েছে । তখন অন্য  
বক্ষুরা বলত, প্রীতম হচ্ছে নীলুর ছায়া । এখন ছায়াই হয়ে গেছে আস্ট্রলি টাকার এমনই  
মহিমা ।

মুমুদের বাড়িটা আমাকে টানছে । তবু আমি যাচ্ছি না, যাচ্ছি না । সংযম ! একেই  
বলে সংযম !

সঙ্গে সাড়ে সাতটার সময়, আমার নিরামিষ যাওয়ার প্রতিজ্ঞার মতন, এই সংযমও  
ভেঙ্গে গেল । বাড়ি ফিরতে গিয়েও আমি উঠে পড়লাম যোধপুর পার্কের একটা বাসে ।

মুমুদের আগের বাড়িটা ছিল আমার শুব চেনা, এই যোধপুরের মতুন ফ্ল্যাটে  
পৌঁছোতে আমার এখনও গোলমাল হয়ে যায় । দু'তিনবার ভুল রাস্তায় গেলাম ; ওদের

বাড়ির নম্বর-টিপ্পর জানি না। কিন্তু এ চুম্বকের টান। সেই টানই আমাকে নিয়ে এলো। ঠিক বাড়ির সামনে।

লাল রঙের গাড়িটা আজও রয়েছে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে। অর্থাৎ ওপরে লালুদা। এটা যে কী ব্যাপার, আজও আমি বুঝি না!

চন্দনদা পছন্দ করে না লালুদাকে। এই নিয়ে নীপা বৌদির সঙ্গে তার বছরের পর বছর ঘণ্টা ঘণ্টা চলছে। অথচ, চন্দনদা ও স্পষ্ট করে লালুদাকে কোনোদিন বলে না যে, তুমি আর আমাদের বাড়িতে এসো না। নীপা বৈদিও লালুদাকে প্রশ্ন দিয়েই চলেছে।

নীপা বৈদি লালুদার সঙ্গে প্রেম করবে, এটা একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। যে-মানুষের মুখে সব সময় একটা কাঁঠালি কলা মার্ক হাসি লেগে থাকে, তাকে কোনো রুচিসম্পন্ন মহিলা কখনও ভালোবাসতে পারে? চুম্ব খাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।

তিনতলায় উঠে বেল দিতেই দরজা খুলে দিল লালুদা। আগেও প্রত্যেকবার ওকেই দরজা খুলতে দেখেছি। যেন এটা লালুদারই বাড়ি। অথচ ওর নিজের বাড়ি নিউ আলিপুরে, বউ-টউও আছে শুনেছি!

লালুদা আমাকে দেখেই গুপ্তধন আবিষ্কারের মতন উহুসে চেঁচিয়ে উঠলো। এই তো নীলকমল! বাঃ বাঃ! এসো, এসো। নীপা, সব প্রবলের সলভড নীচকান্ত এসে গেছে।

আমি ভ্যাবচ্যাক। খেয়ে গেলাম। আমার জন্য সমস্যার সমাধান? সে আবার কেমন সমস্যা?

আওয়াজটা খুব কমিয়ে নীপা বৌদি টি ভি দেখছিল। আমাকে দেখে হেসে বললো, তোমার কথাই বলাবলি করছিলাম একটু আগে। তুমি অনেক দিন আসনি, নীলু!

লালুদা বললো, আঃ, তোমার বাড়িতে টেলিফোন নেই কেন, নীলমণি? অ্যাপ্লাই করলেই আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারি। টেলিফোন না থাকলে দরকারের সময় খবর দেওয়াই যায় না!

যাকে দেখার জন্য এসেছি, সে এখানে নেই।

চন্দনদারও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। চন্দনদা যখন থাকে না, তখনই লালুদা এসে নীপা বউদির কাছে বসে থাকে। আবার লালুদা থাকে বলেই সে সময় বাড়ি ছেরে না চন্দনদ। এ বাড়িতে এই এক অঙ্গুত ব্যাপার চলছে অনেকদিন।

আমি নীপা বউদির দিকে তাকাতেই সে বললো, একটু আগে আমরা তোমার কথাই বলাবলি করছিলাম। বলছিলাম যে, এই সময় চেনাশুনো কেউ এসে পড়লে ভালো হত। নীলু তো আগে প্রায়ই আসত। এখন নীলু আমাদের ভুলে গেছে!

লালুদা জিজেস করলো, তোমার হাতে খানিকটি সময় আছে তো নীলকষ্ট? এই ধরো ঘন্টা দেতেক!

আমি বললাম, হঁা, মানে, সে রকম শুরুতর কাজ কিছু নেই।

লালুদা বললো, ব্যস! সব ঠিক হয়ে গেল। নাও, নীপা, চটপটেক্টের হয়ে নাও!

নীপা বউদি বললো, ব্যাপার কী বুঝলে, নীলু, তোমার চন্দনদা তো এখনো ফিরলো না! আজকাল রোজই খুব দেরি করে, দশটা-সাড়ে দশটা বেজে যায়। এ দিকে আজ আমার বঙ্গ বৈশাখীর বিয়ের দশ বছর উপলক্ষে পান্তি প্রতামার চন্দনদাকে পইপই করে বলে দিয়েছি, প্রেজেক্টেশন কেনা আছে, সেখনে প্রক্রিয়া না গেলে চলে? বৈশাখী তা হলে আর কোনওদিন আমার মুখ দেখবে? আজ স্কালেও বলেছি, আমরা যাবো।

এ ব্যাপারে আমার কী বলার থাকতে পারে? আমি সাদা মুখ করে রইলাম।

নীপা বউদি আবার বললো, যেমন বাবা, তেমন মেয়ে। মুমুরও আজ নেমন্তন্ত্র। বৈশাখী ওকে বিশেষ করে যেতে বলেছে। কিন্তু সে মেয়ে কিছুতেই যাবে না; কী জেনী যে হয়েছে আজকাল! আমাদের সঙ্গে আর কোথাও যেতে চায় না।

লালুদা বললো, আহা, মুমু থাক না বাড়িতে। ওর পড়াশুনো আছে। নীলাষ্঵র এসে গেছে, আর তো চিন্তা নেই। ও থাকবে, থাকবে!

নীপা বউদি মিষ্টি করে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আমি তা হলে একটু ঘুরে আসি? লালুদা আমাকে পৌছে দেবে! এই সময় ট্যাক্সি পাওয়া এত মুশকিল!

লালুদা বললো, শুধু ওখানে পৌছে দেবো কেন? আবার বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়েও যাবো।

নীপা বউদি বললো, আমি বেশি দেরি করবো না, দশটার মধ্যেই ফিরবো। তোমার চন্দনদার আবার হুকুম, মুমুকে একা বাড়িতে রেখে কোথাও যাওয়া চলবে না! মেয়ে এখন বড় হয়েছে, এই বয়েসটা... ওকে বাড়িতে একা থাকতে দেওয়া উচিত নয় ঠিকই। কিন্তু ওর বাবা ইচ্ছে মতন দশটা-এগারোটায় বাড়ি ফিরবেন, আর আমি একা একা বসে বাড়ি আগলাবো? আমি কোথাও সঙ্গের পর বেড়াতে যেতে পারবো না, কোনো সামাজিকতা করতে পারব না? আমাদের কাজের মেয়েটি পর্যন্ত ছুটি নিয়েছে। তুমি ভাই, পিংজ অঞ্জকে একটু থাকো।

লালুদা বললো, বলছি তো থাকবে! এই যে, ইয়ে, তোমার নামটা কী যেন, লালচাঁদ, হঁা, হঁা মনে পড়েছে। লালচাঁদ, তুমি বসে বসে টি ভি দেখো, সময় কেটে যাবে! একটু পরেই একটা হিন্দি ফিল্ম দেখাবে। মুমু পড়াশুনো করছে, ওকে ডিস্টাৰ্ব করবার দরকার নেই।

নীপা বউদি সাজগোজ করে তৈরিই ছিল। চট করে একবার বাথরুমে চুকে ঠোঁটে একবার লিপস্টিক ঘষে, চুলটা আর একবার আঁচড়ে নিয়ে বেড়িয়ে এলো। নীপা বউদির শরীরের গড়নটা চমৎকার, ওকে দেখে কেউ বিশ্বাসই করতে চাইবে না যে ওর একটি সাড়ে ঘোলো বছরের মেয়ে আছে।

মাকে বয়সের তুলনায় ছোট দেখায় আর তার মেয়েকে বয়সের তুলনায় মনে হয় বেশ বড়। রাস্তায় লোকেরা মুমুকে দেখে মনে করে যুবতী।

নীপা বউদি আমার কাছে এসে কাঁধে হাত দিয়ে বললো, তুমি এসে পড়ে বাঁচালে আমাকে। না হলে বৈশাখীর কাছে... নীলু, তোমার কিছু খেতে ইচ্ছে হলে ফ্রিজ খুলে দেখো, খানিকটা পুড়ি আছে, আর একটা অরেঙ্গ ক্ষোয়াশের বোতল...

আমার কাঁধে নীপা বউদির হাত রাখাটা বোধ হয় লালুদার পছন্দ হল না। খপ করে ওর অন্য একটা হাত ধরে বললো, চলো, চলো, আর দেরি করা যাচ্ছে না। চলি হে লালচাঁদ, টা-টা!

এতক্ষণ বাদে আমি বললাম, লালুদা, আমার নামে চাঁদ মেই চাঁদওয়ালা নাম আমার একেবারে পছন্দ নয়।

নীপা বউদি মৃদু ধরক দিয়ে বললো, আঃ, তুমি কী যে উল্টোপাল্টা নাম বলো! তা নীললোহিত নামটা মনে রাখতে পারো না?

লালুদা বললো, আর সকরের নাম মনে থাকে, বিলিভ মি, কত যাড়োয়াড়ি-পাঞ্জাবি-সাহেবদের কঠিন কঠিন নাম ঠিক মনে থাকে, অথচ ওর নামটাই—

নীপা বউদি পাশের ঘরের দরজার কাছে উকি দিয়ে বললো, চলি রে, মুমু! বাবা যদি  
এর মধ্যে ফেরে, তা হলে একটু চা করে দিস!

এরপর দড়াম করে সদর দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল ওরা দু'জন!

এখন ফ্ল্যাটে শুধু মুমু আর আমি!

মুমুর ঘরের দরজা ভেজানো। ও কি এ-ঘরের সব কথাবার্তা শুনতে পেয়েছে? আমি  
অবেশ্য বেশি উচ্চবাচ্য করিনি। মুমু কি ভাবছে ও এখন একা?

নীপা বউদি আমাকে এত বিশ্বাস করে। এখন চন্দনদা এসে পড়লেও আমাকে দেখে  
কিছুই মনে করবে না। আগে মুমুর সঙ্গে এ রকম এই ফ্ল্যাটে কত সময় কাটিয়েছি।  
কিন্তু এর মধ্যে আমি যে কত বদলে গেছি তা তো ওর বাবা-মা জানে না। মুমু বদলে  
গেছে আরও বেশি, গুটিপোকা হয়ে গেছে হঠাৎ প্রজাপতি।

আমি কি লালুদার নির্দেশ অনুযায়ী এই ঘরে একলা বসে থাকবো? টি ভি-টা বন্ধ  
করে দিলাম। আমি এখানে টি ভি দেখার জন্য আসিনি, বই পড়তে আসিনি, ফ্রিজ খুলে  
পুড়িৎ খাবার জন্য আসিনি। মুমুকে দেখতে ইচ্ছে করছে, খুব দেখতে ইচ্ছে করছে!

মুমু পড়ছে পড়ুক, আমি ওর পাশে গিয়ে বসলে কী ক্ষতি হয়! একটানা তো  
বেশিক্ষণ পড়া যায় না, যখন ওর একটু গল্প করতে ইচ্ছে হবে, আমি মুঠিতে ওর একটা  
হাত নিয়ে গন্ধ শুঁকবো। একবার ওর গালে গাল ছোঁয়াবো...

না, না, পাশে বসে একজন কেউ হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে থাকলে পড়ায় মন বসে  
না। আমি তো আর দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারবো না। আর একটু ছেট  
বয়েসে মুমু পড়াশুনোয় খুব ভালো ছিল। মেধাবী মেয়ে, ফার্স্ট বা সেকেন্ড হত প্রতিবছর।  
এখন ফাঁকিবাজ হয়ে গেছে খানিকটা, মাধ্যমিকে প্রথম দশ জনের মধ্যে থাকবে আশা।  
করেছিল সবাই, কিন্তু রেজাল্ট তেমন ভালো হয়নি। এরপর উচ্চ মাধ্যমিকে ওকে ভালো  
করতেই হবে!

কিন্তু যে বাড়িতে বাবা-মা সর্বক্ষণ ঝগড়া করে, সে বাড়ির ছেলেমেয়েরা কি  
পড়াশুনোয় মন দিতে পারে?

আমার টীক্র ইচ্ছে হচ্ছে উঠে মুমুর ঘরে চলে যাই। তবু যাচ্ছি না; যদি নিজেকে  
স্যামলাত না পারিঃ যদি মুমুকে বেশি বেশি আদর করতে ইচ্ছে হয়! আমার সারা শরীরে  
যেন বিদ্যুতের তরঙ্গ ছোটছুটি করছে।

হায় নীললোহিত, তোমার এ কী হলো? মুমুর সঙ্গে তোমার কত সুন্দর সম্পর্ক ছিল,  
সেটা তুমি নষ্ট করে দেবে? হেও না, মুমুর কাছে এখন যেও না, দাঁতে দাঁত চেপে চুপ  
করে বসে থাকো।

খুট করে মুমুর ঘরের দরজা খুলে গেল।

দুপদাপ করে বেরিয়ে এসে ও খুললো ফ্রিজ, একটা জনের প্রেতিক্ষণ বার করে খেতে  
লাগলো চকচক করে।

আমাকে দেখতে পায়নি, আমার উপস্থিতির কথা জানে নি। আমি নিঃশ্঵াস বন্ধ করে  
বসে রইলাম কাঠ হয়ে।

হাওয়ায় একটা ক্যালেন্ডার দুলে উঠে খটাস করে শব্দ হলো একদিকের দেয়ালে  
সেই খনে মুখ ফেরাতেই মুমু দেখে ফেলেছে আমাকে। ঘরের মধ্যে একজন পুরুষ  
বসে আছে, আর একটি মেয়ে তা টের পাবে না, এ কখনো হয়?

মুমুর চোখে কয়েক পলকের জন্য বিশ্বাস হটেই মিলিয়ে গেল। তারপর ক্রোধে লাল হতে লাগলো মুখখন। চোখ দুটো হয়ে গেল হিংসা বাধিনীর মতন। যেন এক্ষুনি আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে টুটি কামড়ে ধরবে

হলুদ-সবুজ মেশানো একটা চোলা ধরনের জামা পরে আছে, ওকে দেখাচ্ছেও একটা চিতাবাধিনীর মতন।

মিষ্টি গলাটাকে বিকৃত করে মুমু বললো, অ্যাই শালা, বু, তুই চোরের মতন এখানে ঢুকে চুপ করে বসে আচিস কেন রে?

খুব রেগে না গেলে মুমু আমাকে তুই বলে না। ওর ভাষা শুনেই বুঝতে পারা যায় রাগের মাত্রা।

আমি নিরীহ ভাবে বললাম, চোর বুঝি কোনো বাড়িতে ঢুকে চুপ করে বসে থাকে?

— তা হলে তুই দারোয়ান?

— দারোয়ানরা তো যুমোয়। আমি ঘুমোচ্ছি নাকি?

— তুই পুলিশ সেজে বসে আছিস!

— এখানে কে আমাকে ঘুষ দেবে?

হাসি-টাসি বা একটুও নরম হওয়ার লক্ষণই নেই। জলের বোতলটা দুধ করে নামিয়ে রেখে, ছুটে এসে আমার চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললো, শালা, ঐ নীপা ঘোষাল আমাকে পাহারা দেবার জন্য তোকে বসিয়ে দিয়ে গেছে! তুই অমনি তা মেনে নিলি? যে যা বলে, তুই তা-ই শুনবি? আমি কঢ়ি কি যেয়ে, মুখ দিয়ে দুধ বেরোয় যে আমাকে পাহারা দিতে হবে? তোকে ডেকে এনেছে ওরা, তুই ওদের চাকর?

চুলের ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে বেশ জোরে জোরে চড় ব-ধাতে লাগলো আমার মুখে, ঘাড়ে, যেখানে পারছে সেখানে!

মারুক, মারুক! আমাকে মেরে যদি ওর রাগ করে তো ভালোই। শুধু রাগ নয়, ওর অপমানও হয়েছে খুব। ওকে বাড়িতে একলা রেখে যাওয়া ঠিক নয় বটে, আবার প্রকটভাবে একজন পাহারাদার বসিয়ে দিয়ে গেলেও ওর মানে লাগতেই পারে। এই বয়েসে ছোট ও বড় সীমারেখাটো খুবই অস্পষ্ট।

— আর মারিস না, মুমু, আমার লাগছে, খুব লাগছে। চুলে ছেড়ে দে!

— আরও মারবো, খুব মারবো! তুই মায়ের কথা শুনতে রাজি হ'ল কেন, বল!

— আমি হঠাৎ এসে পড়েছি।

মুমু এবার একটু দুরে সরে দাঁড়ালো। রাগের চোটে তার কান্না এসে গেছে, টলটল করছে চোখ দুটি।

এত মার খেয়েও আমার ইচ্ছে করছে, চোট দিয়ে ওর কান্না মুছিয়ে নিছি। জিত দিয়ে চেটে নিই ওর লবণাক্ত অশ্রু।

মুমু বললো, তুমি একানে এসেও আমাকে ডাকোনি, আমার সঙ্গে দেখা করোনি তুমি, তুমি একটা ঘরশক্তি ভিত্তীষ্কিকা!

— ভিত্তীষ্কিকা নয়, বিভীষণ। মুমু, আমি কথনও তোর শক্ত হতে পারি?

— এ লেলো বদমাইশটা আমার মাকে নিয়ে হাজোর খেতে যাবে, আর তার জন্য তোমাকে পাহারা দিতে রেখে যাবে?

লালুদাকে মুমু কোনোদিনই পছন্দ করে নিলেও লালুদা কত দায়ি দায়ি উপহার কিনে দিয়েছে, তবু মুমুর মন জয় করতে পারেনি।

— হাতয়া খেতে যাবানি তো নেমন্মন্ম আছে। তোরও তো যাবার কথা ছিল, তুই গেলি না কেন?

— কেন যাবো? বুড়ো-বুড়িরা ওখানে হ্যা-হ্যা-হ্যা করে হাসবে, ধৈর ধৈর করে নাচবে আর বিজিরি বিজিরি রাবীদ্রসঙ্গীত গাইবে, সেখানে আমি গিয়ে কী করবো? এ বৈশাখী মাসিটো অসভ্যের ধারী, আরও দু'জনের সঙ্গে প্রেম করছে, এ দিকে আবার ঘটা করে বিবাহবার্ষিকী করা চাই!

— মুমু, তুই একেবারে পেকে টুস্টুসে হয়ে গেছিস! তোর মুখে ঐ সব কথা শুনতে একদম ভালো লাগে না। তোকে কতবার বারণ করেছি না, শালা বলবি না।

— বেশ করবো। অনেক ছেলেরা বলে কেন?

— তার কারণ, ছেলেদের শালা হয়, মেয়েদের শালা হয় না!

— তোমার কাছ থেকে আমি কোনও কথা শুনতে চাই না। তুমি যাও, চলে যাও, আমাদের বাড়ি থেকে চলে যাও!

— আমি দশটা পর্যন্ত থাকবো বলে যে কথা দিয়েছি নীপা বউদিকে!

— চাকর, চাকর, আমার মায়ের চাকর। আমি আর তোমার সঙ্গে কোনও দিন কথা বলবো না

ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর তৃতীয় উপদেশ ছিল, প্রেমিকার মায়ের বেশি বাধ্য হলে, তার সব হকুম তামিল করলে মেয়েটি সে প্রেমিককে মোটেই পছন্দ করে না। এটা ঠিক মিলে যাচ্ছে দেখছি।

নীপা বউদির সঙ্গে অবশ্য আমার তেমন জমে না কখনও। ব্যবহারে একটু আড়ত ভাব থেকেই যায়। নীপা বউদি আর লালুদার ধারণা, আমি চন্দনদার পক্ষে।

একন চন্দনদা এসে পড়লেই তো পারে। চন্দনদা এত রাত পর্যন্ত থাকে কোথায়? সে রকম মনের নেশা নেই যে বার-রেন্ডেরাঁয় আড়ডা দেবে, তাসও খেলে না। বেহালায় সেই রোহিণী নামে মেরেটির কাছে যায়? লালুদা যেমন এখানে নীপা বউদির দিকে গদগদ ভাবে চেরে বসে থাকে, চন্দনদাও সেরকম রোজ বসে থাকে রোহিণীর সামনে?

এই সময় ফোন বেজে উঠলো

দুটো সেফার মাঝখানে একটা হেট্রি নিচু টুলে থাকে ফোনটা। সেটার উপর একটা তোষালে চাপা দেওয়া দুলো লাগার ভয়ে অনেকে এরকম ফোন ঢেকে রাখে।

কোনটা আমার খুব কাছে বলেই আমি কিছু না ভেবে রিসিভারটা তুলে নিলাম।

দু'বার হালো হালো করলেও কেউ কোনো সাড়শক দিল না। আমি বললাম, যাঃ নাইম কেটে দেল

মুমু চোখ পাকিয়ে বললো, আই, তুমি কোন ধরলে বেম? তুমি আমাদের বাড়ির কেঁ ব্বেদনদার কিছু হোবে না!

আমি বললাম, চন্দনদা ধরলেও একই হত। ইচ্ছে করে ক্ষেত্র দিল। বোঝাই দেল, কোনো পুরুষের সঙ্গে কথা বলবে না!

মুমু সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা মেনে নিয়ে বললো, তুইলে নিশ্চয়ই আনুপম! আমার সঙ্গেই ওর দরবার। তোমার সঙ্গে কথা বলতে যাবেকেন? কেন তুমি ধরলে!

— আনুপম কী রে? শুনলেই গা জ্বালা করে আনুপম বলতে পারিস না!

— তোমার গা জ্বালা করে তো বয়েই গেল। আমার বস্তুরা সবাই আনুপমই বলে!

-তাদের ভুল শব্দের দিতে পারিস না? ভিজে আবার নাম হয় নাকি? বিজয়টা হিন্দিতে  
বড় জোর ভিজায় হতে পারে। তোকে ওরা কী বলে ডাকে?-

-রোমি! আমার ক্লাসেরও সবাই রোমি বলে।

-ইস, এত সুন্দর নাম রম্যানি, সেটা হয়ে গেল রোমি! কোনো মানেই হয় না।  
বিচ্ছিরি শুনতে, মনে হয়। ট্রেলিয়ার কোনো জন্ম..

মুমু আর একটা কিছু কড়া কথা বলতে যাচ্ছিল, এর মধ্যে হঠাতে ঘর অঙ্ককার হয়ে  
গেল। যেমন দপ করে আলো জুলে, সেই রকম অঙ্ককার হবার সময়েও ওই রকম  
একটা শব্দ হয়।

লোডশেডিং-এর প্রথম দু-এক মিনিট একেবারে মিশমিশে অঙ্ককার। নিজের হাত-  
পাও দেখা যায় না। দু'জনেই চুপ।

মুমু বললো, আবার যদি ফোন আসে-

মনে হলো ও সোফার দিকে এগোচ্ছে। তা হলে ওকে আমার জায়গাটা ছেড়ে দিলে  
ভালো হয়।

আমি উঠে এক পা বাড়াতেই মুমুর সঙ্গে আমার ধাক্কা লেগে গেল। কুচকুচে  
অঙ্ককারে দুজনেই জড়ামড়ি করে পড়ে যাচ্ছিলাম, ওর পিঠ আঁকড়ে ধরে সামলে নিলাম  
কোনোক্ষণে।

আমার বুকে মুমুর ছটফটে শরীর।

আর মুমু তখনই সেই চরম কথাটা বললো

- অ্যাই নীলকা, তুমি বুঝি আমাকে জোর করে বুকে চেপে ধরে তাকতে চাও?  
ছাড়ো! এখন আমাকে চুমু খাবার চেষ্টা করবে, তাই না!

আমি মুমুকে এত ভালোবাসি। ছোটপাহাড়ীতে এই রকম একবার অঙ্ককারে মুমু  
নিজেই তয় পেয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। আর একবার বাবা-মায়ের ওপর রাগ করে  
আমার সঙ্গে শুশনিয়া পাহাড়ে যেতে যেতে মুমু বারবার বলেছিল, তু, পৃথিবীতে আমি শুধু  
তোমাকে বালোবাসি, আর কারুকে না, কারুকে না। সেই মুমু!

এখানে এই অঙ্ককারের মধ্যে মুমুকে আমার জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছ করছিল ঠিকই।  
বুকটা ব্যাকুল হয়ে আছে। আমি ওর পিঠে, চুলে হাত বুলোতাম আর টপ করে একটা  
চুমুও খেয়ে ফেলতাম হ্যাতো। তাতে মহাভারত এমন কিছু অশুল্ক হয়ে যেত না

কিন্তু ওই কথাগুলো যখন অন্য সুরে মুমুর মুখ থেকে শুনলাম, আমার একটা প্রবল  
বিড়ম্বা এসে গেল। গুলিয়ে উঠলো সারা শরীর। ওকে বেশ জোরে একটা ধাক্কা দিয়ে  
সরিয়ে দিয়ে তেতো গলায় বললাম, যাও! সরে যা।

মুমু বললো, তোমাকে বলেছিলাম, তোরবেলা আমাকে ময়দানে বিছয় যেতে। তুমি  
তা শোনোনি। তুমি আমার মায়ের চাকর

এতক্ষণ বাদে মুমু এই প্রসঙ্গটা তুললো। এখন আর উন্নত দেবার কোনো মানে হয়  
না।

এই সময় আবার ফোন বেজে উঠলো।

মুমু তুলেই বললো, হ্যালো! কে আনুপম ছাই! আই ওয়াজ এক্সপ্রেক্টিং...হ্যাঁ  
আগেরবার.. আঁ? কবে, সত্যি? হ্রেট, মিচ্যাই যাবো, নাচতে যা ভালো লাগে  
আমার, আর কে কে যাবে...

এতক্ষণ মুমুর কঢ়স্বর ছিল অ্যাসিড মেশানো, এখন মধু চলা : রিসিভারটাকে এমন ভাবে ধরেছে, যেন আদর করছে। মোচড়াছে সমস্ত শরীর, খিলখিল করে হেসে উঠছে কথার মাঝে মাঝে।

পকেট থেকে দেশলাই বার করে জ্বেলে জ্বেলে টেবিলের ওপর একটা মোমবাতি খুঁজে পেলাম। কাল সঙ্কেবেলা ও লোডশেডিং হয়েছিল, পর পর দুদিন, অনেকদিন পর।

মোমটা জ্বালতেই ঘরটার অনেকখানি অংশ নরম আলোতে তরে গেল।

মুম এখনও মগ্ন হয়ে কথা বলে চলেছে।

ওর মুখের একদিকে আলো পড়েছে, আর একটা দিকে দেখা যাচ্ছে না। অন্যমনক্ষভাবে ও সরাচ্ছে কপালের চুল। কী অপূর্ব লাবণ্যময় ওই মুখখানি! মিস্পাপ, সদ্য যৌবনের শুক্রতা মাখানো। একটু আগে ও যে কত খারাপ খারাপ কথা বলছিল, তার কোনো চিহ্নই নেই ওর মুখে। এখন মুমু কী কথা বলছে তা আমি শুনতে পাচ্ছি না। কয়েক মুহূর্ত নির্নিময়ে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে।

হে সুন্দর, তুমি দূরে থাকো। অনেক ক্রপকে দূরে থেকেই ভালো দেখায়, কাছে গেলে আর অপরূপ থাকে না, যেমন চাঁদ! কোনো কোনো সুন্দরকে স্পর্শ করতে নেই, যেমন প্রজাপতির ডানা, ফুলের পাপড়ি। কোনো কোনো সুন্দরকে বুকে জড়িয়ে ধরা যায় না, যেমন বসন্তের বাতাস।

হে সুন্দর, তুমি দূরেই থাকো, আমার স্পর্শ থেকে অনেক দূরে।

## ॥ ৭ ॥

আমার বাবা প্রায়ই বলতেন আঘানং বিদ্ধি।

সংক্ষত-টংক্ষত আমি জানি না, তবে ওই কথাটার মানে হচ্ছে, নিজেকে জানো। নাকি নিজেকে বুঝতে শেখো? নাকি, নিজের দিকে তাকাও? যাই হোক, একই কথা!

পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষই তো নিজের সম্পর্কে ভুল, ধারণায় ভোগে। যে দু'পাতা লেখাপড়া শিখে নিজেকে খুব জ্ঞানী বলে ভাবে, সে আর একজন জ্ঞানীর সামনে এসে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। আমাদের পাড়ার প্রাণকেষ্টদা কবিতা লিখে লিখে আমাদের শোনাতেন, তার ভাবভঙ্গ দেখে মনে হত সে একদিন রবীনুনাথকেও ছাড়িয়ে যাবে। কিন্তু তাঁর একশো উনআশিটা কবিতা ফেরত এসেছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে, একটা ও ছাপা হয়নি, মাত্র একজন সম্পাদক লিখেছিল, প্রাণকেষ্টদা, টাকা দিলে ছাপা হতে পাবে, প্রতি লাইন সাড়ে সাত টাকা!

আমার বাবাই কি নিজেরকে চিনেছিলেন? উনি ক্ষুল শিক্ষক ছিলেন বলে মনে করতেন, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কটাই পৃথিবীর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সম্পর্ক। মনে মাঝে গচ্ছ করতেন, তাঁর অমুক ছাত্র, এখন সরকারের বড় অফিসার, বাজারে ব্যবক্রে দেখেই প্রণাম করে ফেললেন। অর্থাৎ, সেই পাকা চুলওয়ালা, ভারিকী আই এ একজন অফিসারটি বাবাকে দেখে ক্ষুলের ছাত্র হয়ে গিয়েছিল। ছাত্ররা যতই বড় বা বিদ্যুত্ত ছাক, ক্ষুলের শিক্ষকদের ভুলতে পারে না। কিন্তু এক বছর নিজের ক্ষুলে পরীক্ষার সময় বাবা গার্ড দিতে দিতে দেখলেন, তার একটি ছাত্র বই-টই খুলে নির্লজ্জভাবে উঠেছে। বাবা তার ঘাড়ে হাত দিয়ে বললেন, এই, এই রতন, লেখাপড়া কিছু করিসিলি পরাক্রা দেবার কী দরকার? তখন সেই রতন নামে ছেলেটি এক ঘটকায় বাবার ছাত্র সরিয়ে দিল, তারপর একটা ছ' ইঞ্জি ছুরি বাব করে বললো, আবে শালা, চেপে যা! না হলে খোপরি উড়িয়ে দেবো! এই

ধরনের ভাষা শুনে বাবার প্রায় অঙ্গান হবার মত অবস্থা। রত্তা নবশ্য ধরা পড়ে গেল এবং অত বড় ছুরি দেখানোর অভিযোগে তাকে জয়া দেওয়া হলো থানায়। কিন্তু একজন মন্ত্রীর টেলিফোনের জোরে সে ছাড়া পেল কয়েক ঘন্টার মধ্যেই, আবার পরীক্ষা দিয়ে কোনো এক রহস্যময় উপায়ে পাস করেও গেল!

মন্ত্রীর পক্ষপতিত্বে গুণার মুক্তি, এই কাহিনীর মধ্যে কোনো নতুনত্ব নেই। আবহমান কাল ধরেই এককম চলে আসছে। তবে, রতন যে ভেবেছিল, কালে কালে সে এক প্রধান গুণ হবে, সে গুড়ে বালি পড়ে গেল। একবার টেন ডাকাতি করতে গিয়ে হাঁটু থেকে বাঁ পা কেটে বাদ চলে গেল তার। আরে, তুই টেন-ডাকাতি করছিস, কী করে হাঁটু বাঁচাতে হয়, তা শিখবি না? রতন এখন একটা কারখানার গেটের টাইম-কিপার। আর ওই যে মন্ত্রী রতনের মতন অনেককে থানা থেকে ছাড়িয়ে আনত, যে মনে করত জনসাধারণের মাথার ওপর নাচছে, সে পরের নির্বাচনে একেবারে হেরে ভূত। জনগণ তাকে কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলেছে, সে এখন একটা বিক্ষুল দল খুলেছে।

আমার বাবা অবশ্য এসব দেখে যেতে পারেননি। অনেকদিন আগেই তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল।

আমি নিজেই তো নিজের সম্পর্কে একটা 'ভূল ধারণায় ভূগছিলাম'।

ভেবেছিলাম, আমি মুমুক্ষে ভালোবাসলেই সেও আমাকে ভালোবাসবে। অন্য সবাইকে ছেড়ে ছুটে আসবে আমার কাছে। আমি একটি গাধা! মুমু যখন ছোট ছিল, তখন সে আমার সঙ্গে এখানে-সেখানে বেড়াতে যেত, ওর বাড়িতে স্নেহের অভাব ছিল, তাই আমাকে আকঁড়ে ধরেছিল। এখন মুমু বড় হয়ে গেছে, রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন পঞ্চদশী মেয়েরাই পূর্ণিমায় পৌছে যায়, আর মুমুর বয়েস ঘোলোর বেশি, ও এখন বাইরে পা ফেলতে শিখেছে, আমাকে আর পাত্তা দেবে কেন?

চেহারা সুন্দর, তাই মুমুর এখন অনেক স্তোক জুটবে, ওর কাছাকাছি বয়েসের ছেলেরা ওকে পাড়িতে করে বেড়াতে নিয়ে যাবে, বড় বড় হোটেলে নিয়ে যাবে, নাচের আসরে নিয়ে যাবে, ভি সি আর-এ আধা-অসভ্য ফিল্ম দেখাবে। এই রকম একটা তরুণ-তরুণীদের সমাজ তৈরি হয়ে গেছে, সেখানেই ওকে মানবে।

ওই বিজয় আর অনুপমরা সেই সমাজেরই প্রতিনিধি। ওরা জগাখিচুড়ি ভাস্য কথা বলে, রবীন্দ্রসঙ্গীত পছন্দ করে না। বাংলার সংস্কৃতির ওপর ওদরে কোনো শ্রদ্ধাই জন্মালো না, তাতে আমার রাগ করার কী আছে? অনেক ছেলেমেয়েই তো এখন এককম; তাতে আমার রাগ করার কী আছে? আমি কি ওদের শোধরাতে পারবো নাকি? আমার টাকাপয়সাও নেই, দলবলও নেই, কে আমাকে হাহ্য করে?

মুমুর পক্ষে আরও খারাপ সংসর্গে গিয়ে পড়া বিচিত্র কিছু নয়।

বাবা বাড়িতেই থাকে না, মা পরপুরূষের সঙ্গে সময় কাটায়। এই রকম সংসারের ছেলেমেয়েকের যা গতি হয়, মুমুরও তাই হবে। এর মধ্যেই অনেক খারাপ কথা শিখেছে। এর পর বাবা-মায়ের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্ম খারাপ কাজেও প্রবৃত্ত হবে। সমস্ত মানুষ সম্পর্কেই অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের ভাব এসে যাবে; আমি কী করে ওকে ফেরিবো? আমি উপদেশ দিতে গেলেই ফল হবে ফিলেট। আমাকেই ও আঘাত দিতে চাইবে বেশি করে।

আহা, মেয়েটা বড় ভালো ছিল!

এরকম একটা প্রাণবন্ত মেয়ে, পড়াশুনোতেও উজ্জ্বল, ঠিকমতন চালনা করতে পারলে অনেক বড় কাজ হতে পারত ওকে দিয়ে। মুমু যখন আরও ছোট, ও তখন প্রায়ই বলত, আমি কোনোদিন চাকরি করবো না, বিয়ে করবো না, আমি ব্যবসা করবো। যন্ত বড় কারখানা হবে, হাজার হাজার লোক কাজ করবে, জাহাজ ভর্তি করে আমাদের কারখানার জিনিস বিদেশে যাবে, মাড়োয়ারিদের আমি দেখিয়ে দেবো যে, বাঙালিরাও ব্যবসা করতে জানে!

ব্যাপারটা মোটেই সহজ নয়, নিছকই একটা বাচ্চা মেয়ের কল্পনা। কিন্তু এরকম কল্পনারও তো বিশেষ মূল্য আছে। এখন আর মুমু ওসব কথা ভাবে-টাবে না। এখন সে ওইসব ছেলেদের সঙ্গে নাচতে যেতে উৎসাহী।

সেদিন রাতে মুমু যখন টেলিফোনে অন্তহীন কথা বলে যাচ্ছিল, আমি রাগ করে সেই লোডশেডিং-এর মধ্যেই ওকে ফেলে রেখে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন কিন্তু মুমুর ব্যবহারটা আবার হঠাত বদলে গিয়েছিল।

ফোন রেখে ছুটে এসে দরজার কাছে আমার হাত ধরে বলেছিল, এই নীলকা, চলে যাচ্ছ যে? তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

আমার বুক জুড়ে ছিল অভিমানের বাস্প, আমি কোনোক্রমে বলেছিলাম, না, আর কোনো কথার দরকার নেই।

সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে মুমু বলেছিল, ওমা, তুমি রেগে গেছ নাকি? আমি এতক্ষণ তোমার সঙ্গে মজা করছিলাম, বুঝতে পারোনি? হ্যাত ইউ লস্ট ইন্ডুর সেন্স অফ হিউমার? তুমি এত গ্রাম ফেসেড হয়ে আছ কেন?

— মুমু, দু'জন বাঙালির মধ্যে ইংরিজি কথা শুনলে আমার গা জ্বালা করে।

— কেন, ইংরিজি বললে কী হয়েছে?

— তাতে মনে হয়, আমরা এখনও সভ্য হইনি। নিজেদের মনের কথা নিজেদের ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না। যাক গে ওসব কথা। আমাকে এখন যেতে হবে, আমি আর থাকতে পারছি না।

— আমাকে এই অন্ধকারের মধ্যে ফেলে চলে যাবে?

— অন্ধকার বলেই তো চলে যাচ্ছ। আমার এখানে থাকতে আর একটুও ইচ্ছ করছে না।

— না, নীলকা, আর একটু বসো পিঙ্গ। বাবা আসুক। তোমাকে আমি এখন কিছুতেই যেতে দেবো না।

মুমুর এই আকস্মিক পরিবর্তনের মর্ম আমি বুঝতে পারছিলাম না। আদুরে আদুরে গলায় কথা বলছে, আমার একটা হাত ধরে গা ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে!

মুমু আবারু বলেছিল, নীলকা, আমার জন্য তোমাকে একটা উর্ধ্বকার করতে হবে, করতেই হবে।

আমি ওর দিকে তাকিয়েছিলাম শুধু, কোনো কৌতুহল দেখাইনি।

— এ মাসের তিরিশ—একশ্রিং তারিখ পর পর দাঁড়িয়ে ছুটি। আমাদের ক্ষুলও ছুটি। আমার কয়েকজন বন্ধু তখন একটা পিকনিকে যাবে। তোমাকেও যেতে হবে। ওরা তোমাকে নেমন্তন্ত্র করেছে, এই তো টেলিফোনে আনু....মানে, অনুপম বললো।

— তোদের পিকনিকে আমি যাবো কেন? সে প্রশ্নই ওঠে না।

— না, না, চলো, ছেঁয়ো প্রিজ ! খুব মজা হবে। তা ছাড়া ওখানে একটা সিঙ্ক্রেট আছে। সেটা তোমাকে এখন বলবো না।

— তোর ওখানকার গোপন কথা তামি জানতেও চাই না, পিকনিকেও যেতে চাই না।

— কেন এমন করছ, নীচকা ! তুমি না গেলে এরা, এই নীপে আর চন্দন আমাকে যেতে দেবে না।

— পিকনিকে যেতে দেবে না? ছুটির দিনে বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিকে যাওয়াতে আপত্তির কী আছে!

— মা ঐ আনু..মানে..অনুপমকে পছন্দ করে না। একদিন আমি ওর সঙ্গে ষ্টেটের সাইকেলে চেপে যাচ্ছিলাম, লালু শালাটা দেখে ফেলেছে। মায়ের কানের কাছে ঘ্যান-ঘ্যান করে লাগিয়েছে। আমি কোথাও যেতে চাইলে বাবাটাও আজকাল রাগ করে।

— বাবাটা, না বাবা শালা?

— আহি মোটেই তা বলিনি!

— বাবাই বা বাকি থাকে কেন? অস্থি কোনো ভদ্র ছেলেমেয়ের মুখে বাবাকে বাবাটা বলতে অনিনি!

— আমার বাবা কি আমার সঙ্গে—

— সে যাই হোক, মুমু, আমি তোদের ঐ পিকনিকে যাবো না।

— তুমি বুঝতে পারছ না, নীলকা, কাকঢীপের কাছে একটা মন্ত বাগানবাড়িতে পিকনিক! ওখানে রাস্তিরে থাকতে হবে। বাবা-মা আমাকে কিছুতেই ছাড়বে না;

— পিকনিকে গিয়ে রাস্তিরে থাকতে হবে কেন? কাকঢীপ এমন কিছু দূর নয়।

— দু'দিন ছুটি যে। রাস্তিরেই আসল মজা হবে। সারা রাত জেগে..

— তোদের ঐ মজাতে আমি কোনো মজা পাবো না ওদের চিনি না। আমি নাচতে পারবো না, ইংরিজি বলতে পারবো না। তোদের ঐ দলের সঙ্গে আমার একটুও মিলবে না।

— তাহলে তুমি এক কাজ করো! এইটুকু তুমি ঠিকই পারবে। তুমি পিকনিকে আমাকে নিয়ে যাবে বলে বাবা-মাকে রাজি করাও। বাড়ি থেকে আমাকে নিয়ে আনু..মানে অনুপমদের বাড়ি পর্যন্ত পৌছে দেবে, ব্যস তারপর আর তোমাকে যেতে হবে না। দু'দিন পরে আমি তোমাকে একটা টাইম বলে দেবো, তখন তুমি আমাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনবে। ব্যস, কোনো ব্যামেলা নেই। তোমাকেও যেতে হলো না—

আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম

মুমু আমাকে এই ভাবে ব্যবহার করতে চায় অর্থ এখনও ওর মুখে নির্দোষ সারল্য দেন সব ব্যাপারটাই কৌতুক সত্ত্ব কি কৌতুক?

এই জন্যই মুমু হঠাৎ তার মেজাজ বিদ্যুলে আমাকে খাতির করতে ক্ষেপ করেছিল।

একটু পরেই এসে পড়েছিল চন্দনদা।

মুখকানা থমথমে, চোখে লালের ছিটে, চুলগুলো খাড়া খাড়া। নেশা হয়েছে বেশ। আগে নিজের বাড়িতে, ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে চন্দনদাকে একটু-আধটু মদ্যপান করতে দেখেছি, নিজেরই বলত, মদ আমার সহ্য হয় না। এসে বাইরে থেকে মদ্যপান করে আসে! এত পরিবর্তন!

তাহলে রোহিণীর কাছে যায়নি। পর্বত আয়োজিত রোহিণী সেনগুপ্ত মদ্যপান একবারে সহ্য করে না। চন্দনদার নতুন কোনো জায়গায় ঠেক হয়েছে।

চন্দনদার একাট বিরক্ত বিরক্ত ভাব। নীপাঃ বউদি বাড়িতে আছে কি না, তার খোঁজও নিল না। আমাকে দেখেই অকারণে মুমু সম্পর্কে অভিযোগ শুর করে দিল। মুমু লেখাপড়ায় খারাপ হয়ে গেছে, শুল থেকে দেরি করে ফেরে, কোথায় যায় কে জানে, আজেবাজে ছেলেদের সঙ্গে গেশে..

চন্দনদা ঐ রকম মেজাজ দেখে মুমু তখন আর পিকনিকের প্রসঙ্গটা তুলতে সাহস করেনি।

বাড়ি ফেরার পথে সেদিন আমার মনে একটা কথা খচখচ করছিল। মুমু ঐ অনুপমের সঙ্গে মোটর বাইকে চেপে ঘুরে বেড়ায়। তা হলে চন্দননগরে আমি ঠিকই দেখেছি। অনুপমই আমার রিঙ্গাকে ধাক্কা মের পালিয়ে গিয়েছিল।

অনুপম কিংবা বিজয়কে আমার ঈর্ষা করার কোনো কারণ নেই ওরা আমার চেয়ে বয়েসে পাঁচ-ছ বছর ছোট, ওদের সমাজটাই মুমুকে আকৃষ্ট করে। ওদের কারুর গাড়ি আছে, কারুর মোটর বাইক, বান্ধবীকে নিয়ে ঘোরার কত সুবিধে। আমি সাইকেল ছাড়া আর কিছুই চালাতে জানি না, আর আমার একখান নিজস্ব সাইকেলও নেই।

ঠিক আছে, মুমু ঐ অনুপমের সঙ্গে মোটর বাইকে চেপে ঘুরুক না, মোটর বাইক চালাবার মধ্যে বেশ একটা পৌরহন্তের ভাব আছে, মেয়েরাও বেশ পছন্দ করে। কিন্তু মুমু যার সঙ্গে মিশেই, সে ভদ্র হবে না কেন? নিজেই দোষ করে অনুপম একটা সাইকেল রিঙ্গাকে ধাক্কা দিল, রিঙ্গাওয়ালাটি ছিটকে পড়ে গিয়ে মাথা ফাটালো, তবু সে একটু দাঁড়ালো না! ওটা অনুপমের মামাবাড়ির পাড়া, ওকে সেখানে কেউ মারধর করত না, ওর কি উচিত ছিল না, রিঙ্গাওয়ালাটিকে মাটি থেকে তোলা, তাকে দু'-একটা সহানুভূতির কথা বলা?

এর দু' দিন পরেই অনুপমের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল পার্ক সার্কাসের মুখটায়। সবে সংকে হয়ে এসেছে, ছিপ ছিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। অনুপম একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট কিনছে। পানওয়ালাটির সঙ্গে ওর বেশ চেনা আছে মনে হলো, হেসে হেসে কথা বলছে তার সঙ্গে। আমি ট্রান্স থেকে নেমে প্রীতমের বাড়ির দিকে যাচ্ছি, এমন সময় ওকে দেখতে পেলাম

প্রথমেই আমার মনে হলো, এইসব ছেলেরা অর্ধেক ইংরিজি ছাড়া একটাও বাক্য বলতে পারে না তা হলে পানওয়ালা, বাদামওয়ালার সঙ্গে এরা কী ভাষায় কথা বলে? বাবা-মা'র সঙ্গে তো ইংরিজিতেই বলতেই পারে, সে রকম বাবা-মা না হলে আর এই ধরনের ছেলেমেয়ে তৈর হবে কেন? কিন্তু আমাদের দেশে রাস্তাধাটে চলতে গেলে তো এমন অনেক লোকের সঙ্গে কথা বলতেই হয়, যার একটা বর্ণ ইংরিজি জান্তুনা!

অনুপমের সঙ্গে আমার যেচে কথা বলার কোনো ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু সে-ই আমাকে দেখতে পেয়ে গেল। হাসি মুখে হাত তুলে বললো, আমের আংকল, আপনি এদিকে, হোয়াট উইল্ড ব্রট ইউ হিয়ার?

আমি শুকনো ভাবে একটু হেসে বললাম, এই এদিকে শেক বন্ধুর বাড়িতে...

সিগারেটের প্যাকেটটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, কেয়ার ফর আ ফ্যাগ?

আমি বললাম, না!

অনুপম জোর দিয়ে বললো, আমি আপনাকে শ্বেত করতে দেখেছি। প্রিজ হ্যাত ওয়ান!

আমি ধুমপায়ী ঠিকই, কিন্তু সকলের কাছ থেকে সিগারেট নিতে ইচ্ছে করে না, বয়েসে ছোট বলে নয়, ওরকম ছুঁমার্গ আমার নেই, তবে রাস্তায় কারূর কাছ থেকে সিগারেট নিলে তার সঙ্গে দু' মিনিট অন্তত কথা না বললে চলে না।

আরও দু' মিনিট এই ধরনের ট্যাস-ট্যাস ভাষা শুনলে যে আমার মাথা গরম হয়ে যাবে!

অনুপম তবু জোর করতে লাগলো, শেষ পর্যন্ত একটা নিতেই হলো।

ওর কথা কেমন যন জড়ানো জড়ানো। মদ খেয়েছে নাকি? চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পড়ছে, খেতে তো পারেই! কিন্তু ওর চোখ পরিষ্কার। এই বয়েসের ছেলেরা একা একা মদ খায় না।

অনুপম বললো, রোমি আপনার কথা...লট্স অ্যান্ড লট্স অফ স্টোরিজ, ভেরি ফানি স্টোরিজ, আপনি নাকি ভেরি অফন—ইউ ডিজাপিয়ার ফ্রম দা সিটি!

সিগারেটটা অর্ধেক শেষ হয়ে গেছে, বললাম, এবার আমি চলি!

অনুপম বললো, কোথায় যাবেন? আমি আপনাকে লিফ্ট দিছি।

আঙুল তুলে সে রাস্তার ধারের একটা মোটর বাইক দেখালো।

—না, না, তার কোনো দরকার নেই কাছেই যাবো আমি!

— চলুন না, নো প্রবলেম, আপনাকে লিফ্ট দেবো, ইট উইল বী আ হেট অনার, আপনি রোমির অংকল।

হিন্দি সিনেমাগুলো ড্যাডি, মামি' আর আংকল এই তিনিটি শব্দকে সর্বভারতীয় করে দিতে চায়। শুনলেই আমার গা জুলে। আমি কী করবো, আমার স্বত্তাটাই যে এরকম। মুমুও আমাকে প্রথম প্রথম আংকল বলত, অনেক বকে বকে ছাড়িয়েছি।

অনুপম আমাকে পৌছে দেবেই। আমি ওর মোটর বাইকে যে কিছুতেই চাপবো না, এ ছেলেটি সেটা কিছুতেই বুঝবে না। ওর মাথায় যেন ঘোঁক চেপে গেছে।

এবার ও আমার হাত চেপে ধরলো।

যা ভেবেছিলাম তাই। এতক্ষণ ওর জগাখিচুড়ি ভাষা শুনতে আমার পা থেকে শরীর গরম হতে শুরু করেছিল। এবার ও হাত ধরতেই আমার মাথা গরম হয়ে গেল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, অনুপম, তুমি মোটর বাইক কতদিন চালাচ্ছ?

—দু' তিন বছর! ইয়েস, টু ইয়ার্স অ্যান্ড সেভেন মান্থস, টু বি একজ্যাক্ট!

—তোমার লাইসেন্স আছে?

—অফ কের্স!

—আমার মনে হয়, তোমার লাইসেন্স নেই!

—হেয়াট; হ্যাল্ড ইট দ্যাট!

—তুমি এখনও ভালো চালতে জানো না। অ্যাকসিডেন্ট করে আমার মনে হয়, তোমার গাড়িতে অন্য কারুকে চাপানো উচিত নয়। আগে তুমি ভালো করে শেখো।

—অ্যাকসিডেন্ট? নেভার ইন· মাই লাইফ-কে বলেছে আপনাকে? আংকল, ইট আর ক্রসিং দো লিমিট! আপনি আমার বাইকে কৃষ্ণও চাপেননি, তবু ইট আর সারমাইজিং...

—কয়েকদিন আগে তুমি চন্দননগরে একচো সাইকেল রিস্কার সঙ্গে অ্যাকসিডেন্ট করোনি?

— ওঃ, দ্যাট বাস্টার্ড! ও লোকটা... ওদের বেল থাকে না, আলো থাকে না, ব্লাডি বাস্টার্ড, গলির মোড়ে হৃত্তুড়িয়ে এসে পড়লো।

— তুমি ওকে বাস্টার্ড বললে? দোষ ছিল তোমারই। তুমি গলি থেকে জোরে বেরিয়ে এলে, বড় রাস্তাটা দেখে নিলে না!

এবার অনুপম উত্তেজিতভাবে চেঁচিয়ে উঠলো, উ আর অ্যাকিউজিং মি! হোয়াট রাইট ইউ হ্যাভ গট?

আমি বাঁ হাতটা তুললাম। একটা আঙুলের গাঁটে সেই খোচাট! এখনও ছোট্ট একটা ঘায়ের মতন হয়ে আছে।

আমি গভীরভাবে বললাম, আমি নিজে ছিলাম সেই রিস্কায়। রিস্কাওয়ালার কপাল ফেটে রঞ্জ পড়ছিল। আমারও জোর চোট লাগতে পারত!

অনুপম আরও জোর চেঁচিয়ে বললো, ড্যাম লাই, ড্যাম লাই!

আর একজন লোক যে কখন আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে লক্ষ করিনি।

বেশ বিশাল পুরুষ। দামি চুন্ট-শেরোয়ানি পরা, মুখে ফ্রেঞ্চ কাট দাঢ়ি, সোনালি ক্রেমের চশমা! দেখলেই মনে হয় কেউকেটো ধরনের মানুষ।

সে লোকটি বললো, কী হয়েছে, অনুপম?

অনুপম বললো, দিস পার্সন... আমার নামে ফ্ল্ৰ অ্যাকউজেশান দিচ্ছে। আমি অ্যাকসিডেন্ট করেছি। চন্দননগরের রিস্কাওয়ালা... দে আর অল বাগারস্।

ফ্রেঞ্চ কাট দাঢ়িওয়ালা লোকটি আমার আপাদমস্তক চোখ বোলালো।

আমার সাধারণ পাজামা-পাঞ্জাবি পরা পিংখার চেহারাটি তার পছন্দ হলো না। বন্দুত সে যেন মানুষ বলেই গণ্য করলো না আমাকে। ঠোঁটটা সামান্য বেঁকিয়ে বললো, ধান!

আমি অনুপমকে বললাম, আমি নিজে সেই রিকশায় ছিলাম, আমার হাতে লেগেছে, আমি নিজের চোখে সব দেখেছি, আমি কি মিথ্যে কথা বলছি?

অনুপম তবু তেড়িয়া ভাবে বললো, ইট ওয়াজ নট মাই ফন্ট!

ছাগলদাঢ়ি লোকটা আমার কাঁধে তার থাবার মতন একটা হাত রাখলো। তাতে জোরে চাপ দিয়ে বেশ জোর গলায় বললো, বললুম না চলে ধান। কেন এখানে ঝামেলা করছেন। ওর সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।

তক্ষনি লোকটার মুখে আমার একটা ঘুঁষি কষাতে ইচ্ছে হয়েছিল।

ব্যাটাছেলের ছোওয়া আমার বিশ্বী লাগে। অচেনা লোক কাঁধে হাত দিলে সেটা তো অসভ্যতার চরম। তার ওপর ওরকম ধর্মকের সুরে কথা বলার কী অধিকার আছে ওর?

লোকটির শরীরের ওজন আমার দ্বিগুণ তো হবেই। আমার ঘুঁষির উত্তরে ও একখানা ঘুঁষি মারলে আমি ছাতু হয়ে যাবো।

তা ছাড়া, অনেক লোককেই শাস্তি দিতে ইচ্ছে করে বটে, কিন্তু মঙ্গলারির ব্যাপারে আমার সে রকম কোনো দক্ষতা নেই। কারণকে মারবার জন্য শেষ পর্যন্ত হাত ওঠে না। বেশির ভাগ সময় আমিই মার খাই।

দুজনে দুজনের দিকে কটমট করে চেয়ে রইলাম কয়েক পলক।

অনুপম হঠাৎ নরম হয়ে গিয়ে বললো, না, না, ডার্ম আমার চেলা। জাস্ট ফ্রেন্ডলি তক হচ্ছিল। আংকল, আপনি কোথায় যাবে ন বলছিলেন? নো হার্ড ফিলিংস! আবার দেখা হবে। বাই-ই!

লোকটি আমার কাঁধ থেকে থাবাটা নামিয়ে নিল।

পরাজিত লোকরা যেমন মনে মনে গজরায়, সেই ভাবে আমি মনে মনে বললাম,  
এই সব লোকদের সঙ্গে কথা বলতেও আমার ঘেন্না হয়। এখানে দাঁড়ানোটাই আমার ভুল  
হয়েছে।

মুমু এই অনুপমের মোটের বাইকে চড়ুক, যা খুশি করুক, গোল্লায় যাক তাতে  
আমার কী? চন্দনদা-নীপা বউদি যদি নিজেদের মেয়েকে সামলাতে না পারে—

মুখখানা তেতো হয়ে রাইলো।

## ॥ ৮ ॥

পরদিন রাত আটটা আন্দাজ বাড়ি ফিরে দেখি আমার ঘরে, আমার বিছানায় লধ হয়ে  
শুয়ে আছে প্রীতম। পাশে শূন্য চারের কাপ, অ্যাশট্রেতে কয়েকটা সিগারেট। এখনও  
একটা সিগারেট ঠোঁটে নিয়ে ধোঁয়ার রিং করছে। ভালো ফোটোগ্রাফার হতে গেলে এ  
রকম রিং করা শিখতে হয়।

হাতে একটা পত্রিকা, আমার নয়, ও নিজেই এনেছে, তাতে শুধু ছবি এখন ছবির  
বই ও বিদেশি ছবির পত্রিকা ছাড়া আর কিছু পড়ে না প্রীতম। শুয়ে শুয়ে পা নাচাচ্ছে।  
আমি ঘরে চুকতেও তাকালো না, কারণ, যে ছবিটা ও দেখছে, তার থেকে চোখ ফেরানো  
শক্ত।

আজ বড় ভ্যাপসা গরম, আমি জামাটা খুলে ফেললাম।

প্রীতম পা নাচাতে নাচাতেই বললো, তুই কাল আমার বাড়িতে গিয়েছিলি, মীলু?  
—হ্যাঁ। বাড়িতে কেউ ছিল না। নিচের দারোয়ানকে বলে এসেছিলাম।

—সে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারেনি, তোর নাম ভুলে গেছে। তবু আমি আন্দাজ  
করেছি। তারপর এমন লজ্জা পেয়ে গেলাম।

—কেন! লজ্জার কী আছে? আমি তো খবর দিয়ে যাইনি।

—সেজন্য না। তুই যাবার একটু আগে আমি বেরিয়েছি। আমার বাড়ির আর সবাই  
তো গেছে ভাগলপুর আমি বেরিয়ে একটা ট্যাঙ্কি নিয়েছি। তোকে আমি দেখতেও  
পেরেছিলাম পার্ক সার্কাস মোড়ের কাছটায়, তুই একজনের সঙ্গে কথা বলছিলি, আমি  
বুঝবো কি করে যে তুই আমার বাড়িতেই যাচ্ছিস। আমি থামিনি, আমার এমন জৱাবি  
একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, দেরি করার উপায় ছিল না।

বিদ্যুতের মতন আমার মাথায় একটা চিঞ্চ এলো। কাল আমাকে দেখে প্রীতম যদি  
নেমে পড়তো, তা হলে ছবিটাই বদলে যেত। তা হলে কি ঐ ছাগল-দাঢ়ি লোকটা আমার  
ঘাড়ে চাপড়ে মেরে হমকি দিয়ে কথা বলতে পারতো? আমার পাশে একজন বকু থাকলে  
অনেকে জোর এসে যেত আমার গলায়।

ম্যাগাজিনটা সরিয়ে রেখে উঠে বসে প্রীতম বললো, ছি ছি ছি, কাও বল তো।  
তুই গেলি..দু-এক বছর আগেও রাস্তায় কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে নেমে না থেমে কোথাও  
চলে যাবার কথা কল্পনা করতে পারতাম? এখন এত কাজ করতে গেছে...বয়সের সঙ্গে  
সঙ্গে মানুষকে এমন বদলে যেতে হয়!

—এখন বুঝি তোর খুবই কাজ?

—হ্যাঁরে, আবার নতুন একটা লাইন ধরেছি সিনেমার স্টল ফোটোগ্রাফি করছি।  
সিনেমার কাজ তো জানিস, সময়ের কোনো ব্যবসার নেই, ভোরবেলা যেতে হয়, মাঝ  
রাতে যেতে হয়। যখন-তখন আউটডোর শুটিং-এ যেতে হয়।

— তা হলে সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে তোর আলাপ হয়ে যায়?

— আরে রাখ তোর হিরো-হিরোইন। সব ক'টা ফোটোগ্রাফারদের তেল দেয়। আমি যে ষিল ছবি তুলবো, তা দিয়েই তো সব পত্র-পত্রিকায় পাবলিসিটি হয়।

— আমি কথনও সিনেমার শুটিং দেখিনি। একদিন দেখবি, প্রীতম?

— যে-কোনো দিন। খুব বোরং হয় কিন্তু আগে থেকেই বলে রাখছি। তুই পার্ট করতে চাস? বল, ব্যবস্থা করে দিতে পারি। এই তো একটা নতুন ছবি শুরু হচ্ছে। তার স্ক্রিন টেস্ট চলছে। তোর যা চেহারা, তুই নায়কও হতে পারবি না, ভিলেইনও হতে পারবি না, নায়কের বক্সু-টেন্সু, দু-এক সিনেমার পার্ট।

— না ভাই, আমার পার্টফার্ট করার ক্ষমতা নেই। এমনি একদিন দেখতে যেতে পারি।

— গেলে তোর অনেক অভিজ্ঞতা হবে। কত রকম ক্যারেক্টার দেখতে পাবি! সিনেমাতে আর কী দেখা যায়। আসল ক্যারেক্টারগুলো তো থাকে ক্যামেরার পেছনে!

— তুই তা হলে পয়সাকড়ি ভালোই পাইছিস?

— সিনেমার লাইন ভাই ফোরটুয়েন্টির লাইন। কেউ যদি বলে, পরে পয়সা দেবো, ক্ষনে বিশ্বাস করতে নেই। যত ছবির মহৎ হয়, তার চার ভাগের এক ভাগও শেষ হয় না। এক দল লোক আছে যারা নতুন কোনো প্রেক্ষিতাসার জুটিয়ে তার মাথায় কাঁঠাল ভাঙে। দু-চারদিন শুটিং করে কোথায় হাওয়া হয়ে যায়। যাকগে ওসব কথা। তুই কাল গিয়েছিলি, বিশেষ কোনো দরকার ছিল?

— তা ছিল একটু।

— কী ব্যাপার বল তো?

আমি একটু ইতস্তত করতে লাগলাম। যে কথাটা প্রীতমের বাড়িতে গিয়ে কিংবা রাস্তায় দেখা হলে বলা যায়, নিজের বাড়িতে সে কথাটা মুখ দিয়ে বেরতে চায় না।

উড়িয়ে দেবার ভঙ্গি করে বললাম, এমন কিছু জরুরি নয়। তুই আর এক কাপ চা খাবি?

প্রীতম বললো, নাঃ। তোর বাড়িতে ব্র্যান্ডি আছে?

— বাড়িতে ওসব রাখবো? তোর মাথা খারাপ নাকি? আমি কি কোনো বড় কম্পানির মাঝারি অফিসার?

— আজকাল বড় টায়ার্ড থাকি রে, নীলু। একটু ব্র্যান্ডি খেলে ভালো লাগে।

— তুই মাঝারি অফিসারদের কাছাকাছি পৌছে গেছিস, প্রীতম। আমি ব্রেকার।

— কিন্তু তুই ফরেন ঘূরে এসেছিস! আমি যাইনি এখনো।

— সে তো পি সি সরকারের ম্যাজিকের দলেও অনেকে বিলেত র্যায়। তা বলে কি আর তাদের ‘বিলেত-ফেরত’ বলা যায়? আমিও ঐ রকমই প্রেক্ষিতাসারে প্যাকেটগুলো কিসের?

— কতকগুলো ছবির প্রিন্ট, আজ পেলাম। দেখিবি!

— সিনেমার ছবি?

প্রীতমের তোলা ছবি আমার আগ্রহ নিয়ে দেক্ষা-উচিত। যদিও সিনেমার ষিল ছবি প্রায় সবই এক রকম লাগে আমার কাছে। গল্পটা স্মা জানলে তার এক একটা দৃশ্য দেখার কী মানে হয়?

নকল আগ্রহ নিয়ে আমি ছবিগুলো দেখতে দেখতে বলতে লাগলাম, বাঃ, ফোটোগ্রাফি তো দারুণ ভালো, এটা খুব সুন্দর অ্যাপ্লেশন, এখানে আলো তার ছায়ার ব্যবহার খুব চমৎকার

একথানে ছবিতে আমার চোখ আটকে গেল শুধু তাই না, ধক করে উঠলো বুকটা।

একটা ঘোড়ার পিঠে লাগাম ধরে বসে আছে মুমু টুকরো টুকরো আয়না বসানো রাজস্থানী পোশাক পরা। মাথায় একটা পালকের মুকুট, কেমনের তলোয়ার! ময়দানের বেতো ঘোড়া নয়, বেশ বড় তেজী ঘোড়ার পিঠে মুমু সহাস্যে চেয়ে আছে যেন আমারই দিকে।

আমি একদিন কল্পনায় এ দৃশ্য দেখেছিলাম। প্রীতম আমার সেই কল্পনার ফোটোগ্রাফ তুললো কী করে?

ছবিটা তুলে ধরে ফ্যাকাসে গলায় জিজ্ঞেস করলাম, এটাও কি কোনো সিনেমার ছবি?

প্রীতম বললো, ঠিক ফিল্ম বলা যায় না। একটা ছবি তৈরি হবে। সেটার জন্য বিভিন্ন চরিত্র বাছাই হচ্ছে। বিভিন্ন অ্যাকশনের ছবি তোলা হচ্ছে। গল্পটার নাম 'রাজা'র মেয়ে ভিখারিনী'

—বাংলাদেশের গল্প মনে হচ্ছে?

—ঠিক ধরেছিস। 'বেদের মেয়ে জোছনা'র পর এখন এরকমই চলছে। বাংলাদেশে হিট হবার পর কলকাতায় আবার তৈরি হচ্ছে সেটা। ওখানকার গল্প, এখানকার পরিচালক : সাঁইত্রিশ খানা গান!

—এই মেয়েটি নায়িকা?

—আরে না, না। নায়িকা আসবে ঢাকা থেকে, নায়ক কলকাতার; এ মেয়েটির ছোট পার্ট, ফ্ল্যাশ ব্যাকে নায়িকার ছোটবেলার দুটো-তিনটে সিন। আসল গল্প তো রাজকুমারী ভিখারিনী হয়ে যাবার পর, তখন তার জামা-টামা ছেঁড়ে থাকবে।

‘আমি একটা দীর্ঘস্থান গোপন করলাম।

এটাই তা হলে মুমুর ঘোড়ায় চড়তে শেখার উৎসাহের আসল কারণ। মুমু গোপনে গোপনে সিনেমায় নামার চেষ্টা করছে?

সিনেমায় নামাটা খারাপ কিছু নয়। সিনেমাও একটা শিল্প। মুমু একসময় মেরিল স্ট্রিপ বা শাবানায় আজমি বা রূপা গান্দুলির মতন দারুণ অভিনন্দনী হয়ে যেতে পারে।

সিনেমা খারাপ নয়, নাচও খারাপ নয়। মুমু কোথায় কোথায় নাচতে যায়, নাচ তো মেয়েদেরই ভালো মানায়। মুমু হয়ে যেতে পারে সোনাল মানসিং। বন্ধুদের সঙ্গে আড়তাও খারাপ নয়, পিকনিক খারাপ নয়, মোটর বাইকের পেছনে চাপাও খারাপ নয়। নির্ভর করছে কী রকম সংসর্গ। আমি তার বিচার করার কে?

ছবিটার দিকে একটু বেশিক্ষণই তাকিয়ে ছিলাম, প্রীতম হঠাতে জিজ্ঞেস করলো, নীলু, তুই চতুর্ভুজ শেষকে কী করে চিনলি রে?

আমি বিশিত চোখ তুলে বললাম, সে আবার কে?

—বাঃ, তুই যে কাল কথা বলছিল তার সঙ্গে!

—আমি জীবনে এই নামই শুনিনি। কোথায় কথা সিনেছিলাম তার সঙ্গে?

—পার্ক সার্কাসের মোড়ে।

—সে তো অনুপম বলে একটা ছেলের সংকে কথা বলছিলাম। তোর ভুল হয়েছে দেখতে।

— মোটেই ভুল হয়নি। দুজন ছিল। তাদের মধ্যে একজন চতুর্ভূজ শেষ বিরাট চেহারা, ক্ষেপ কাট দাঢ়ি আছে। তোর কাঁধ হাত দিয়ে কথা বলছিল, মনে হলো তোর খুব চেন!!

আমি একটুক্ষণ ছুপ করে রইলাম। অপমানবোধটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো লোকটাকে আমার ঘূঁষি মারা উচিত ছিল, কিন্তু চলে আসতে হয়েছে মাথা নিচু করে।

আন্তে আন্তে বললাম, কালই ওকে প্রথম দেবেছ। চতুর্ভূজ শেষ, অস্তুত নাম, বাঙালি? পরিষ্কার বাংলা বলছিল।

— বাঙালিও বলতে পরিস। তিন চার পুরুষ ধরে এখানে আছে। বাংলা তো ভালো বলবেই।

— লোকটি বিখ্যাত কেউ নাকি?

— তুই এত কম জানিস, নীলু! বেশি লোকের সঙ্গে তো মিশিস না। বিখ্যাত কেন হতে যাবে? এক একজন লোক থাকে, যাদের অনেকেই চেনে, অনেকেই খাতির করে, কিন্তু তার নামটা উচ্চারণ করে না।

— সত্যি আমি কম জানি। কেন লোকে খাতির করে, অথচ নাম উচ্চারণ করে না?

— ওর অনেক টাকা। ড্রাগের টাকা কলকাতার যত ড্রাগ বিক্রি হয়। তার বেশির ভাগই ও কট্টোল করে। টাকার জন্য লোকে ওকে খাতির করে। যেমন ধরো না, বড়বাজারের ঐ যে রাশিদ থান, বোমার যার বাড়ি উড়ে গেল। সাঁও জুয়ার রাজা, তার নাম তুই আগে কখনো শনেছিস? অথচ এখন তো জানা যাচ্ছে, অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গেই তার চেনা ছিল। এরা বিখ্যাত নয়, কিন্তু এদের দারুণ ক্ষমতা।

প্রীতমের শোয়ের দিকের কথাগুলো আমি শুনলাম না। আমার মাথা ঝিমঝিম করছে। ড্রাগ! অনুপমের কথাগুলো জড়ানো জড়ানো ছিল, অকারণে উন্নেজিত হয়ে উঠছিল, মদের নেশা করেনি, তার মানে ড্রাগের নেশা। সে ছেলে মুরুর বস্তু?

ইংরিজি বল: অনুপম একটি পানওয়ালার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলছিল। তারপর সেখানে হাজির হলো ড্রাগের রাজা। ওখানে কিছু একটা ব্যাপার আছে।

— তুই এ লোকটাকে চিনিস প্রীতম?

— চিনবো না কেন? অনেকবার দেখা হয়েছে। আমাকে কত রকম লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়।

— তুই জানিস, ও ড্রাগ বিক্রি করে। কত ছেলেমেয়ের সর্বনাশ করে। তবু তুই ওকে পুলিশে ধরিয়ে দিসনি?

— কো ছেলেমানুমের মতন কথা বলিস, নীলু। আমি ওকে ধরিয়ে দিতে যাবো কেন? পুলিশ কিছু জানে না ভাবিস? পুলিশ সব জানে। আমি ওকে গাঁটাতে হুলে। ওর হাতে অনেক গুণ্ঠা আছে, আমাকে খুন করে লাশটা পুঁতে দেবে ধাপার মাঝে। আমার গায়ের যাংসের সার পেয়ে সেখানে ভালো ফুলকপি ফলবে।

— তুই শুধু ওকে চিনিস, না ওর হয়ে কাজও করেছিস!

— দু' একবার কাজও করেছি।

— এ লোকটাও সিনেমা লাইনে আছে নাকি?

— থাকবে না? সিনেমা লাইনের টাকা যেকোথা থেকে কী ভাবে আসে তা তুই কল্পনা করতে পারবি না। ড্রাগের টাকা, সাঁওর টাকা, আগলিং-এর টাকা, ও সব

টাকাতেই তো বেশির ভাগ সিনেমা তোলা হয়। বহুর সিনেমা জগৎকা তো এই ভাবে চলছে।

—আর তোরা সেই টাকা নিস?

— অমিতাভ বচনও নেয়। শাবানা আজমি, নাসিরুদ্দিন শাহ নেয়। আমি তো চুনোপুঁটি। তবে, আমাদের বাংলায় দায়ুদ ইত্রাহিমের মতন রাঘব বোয়াল তো নেই। দু' চারটে ছোট ছোট প্রোডিউসারও আছে, যারা নিজেদের কষ্টে উপার্জন করা টাকায় ছবি তোলে। অর্ট-ফার্ট ভালোবাসে। তাদের অনেকেই টাকা জলে যায় অবশ্য।

— প্রীতম, তুই কত কী জানিস? এই ক'বছরে এত বদলে গেছিস!

— তুমি আর নেই সে তুমি! এই গানটা গাইবি নাকি?

আমি মুমুর ছবিটার দিকে আবার তাকিয়ে রইলাম। মুমু ফিল্মে নামবার চেষ্টা করছে, এ কথা আমাকে ঘৃণাক্ষরেও বলেনি। চন্দনদারও কি জানে? ফিল্ম লাইন হয় খুব উঠান, অধৰা একেবারে পতন। মাঝামাঝি কিছু নেই বোধহয়। পতনের সংখ্যা অনেক বেশি। মুমু কি লেখাপড়া ছেড়ে দেবে?

প্রীতম উকি মেরে বললো, তুই এই ছবিটা বারবার দেখছিস! মেয়েটা দারুণ, এক টুকরো আগুন যাকে বলে। তুই ওকে চিনিস নাকি?

আমি আন্তে আন্তে মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ, চিনি। তুইও ওকে চিনিস, প্রীতম। আর একটু ছোট অবস্থায় দেখেছিস ও তো চন্দনদার মেয়ে মুমু!

প্রীতম দারুণ চমকে উঠে বললো, অ্যাঁ, চন্দনদার সেই মেয়ে? ও হঠাৎ এত বড় হয়ে গেল কী করে?

— বেশি বড় হয়নি, বয়েস যথেষ্ট কম, কিন্তু চেহারাটা বড় হয়ে গেছে।

— বারণ কর, বারণ কর, নীলু, শিগগির বারণ কর। চন্দনদার মেয়ের পক্ষে এসব ভায়গায় যাওয়া একেবারে উচিত নয়। খুব খারাপ, খুব খারাপ!

— কেন, এ রকম বলছিস কেন? খারাপের কী আছে?

— কত রকম র্যাকেট আছে, তুই জানিস না যে! একটু আগে বললাম না, অনেক ফিল্মের শুধু মহরৎ হয়, আর শেষ হয় না। আবার অনেক সময় হয় কী জানিস, একটা ফিল্মের কথা ঘোষণা করা হলো, তারপর বিজ্ঞাপন দিয়ে পাত্রপাত্রী বাছ হলো, যা দরকার তার চেয়ে বেশি বাছ হলো। মনে কর, পঁয়াঙ্গিষ্টা ছোট - বড় রোল, কিন্তু ছেলেমেয়ে বাছ হলো একশোটা। কিছু দিন তাদের নিয়ে এক সঙ্গে বসা হলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর ফিল্ম শুরুই হলো না। এই একশোটা ছেলেমেয়ে আশায় আশায় রইলো। চতুর্ভুজ শেষ এই ধরনের কারবার করে

— ‘রাজার মেয়ে ভিখারিনী’র সঙ্গেও ওর যোগ আছে নাকি?

— যোগ মানে, চতুর্ভুজই তো প্রয়োজক! বাংলাদেশ থেকেও জেনে নিয়ে এসেছে, সবাইকে এখন কোলাছে। আমি অবশ্য ভাই আমার ছবিগুলোর জন্য পঁয়সা আদায় করে নিয়েছি।

— কিন্তু এরকম কারবার করে চতুর্ভুজের লাভ কী প্রেতগুলো ছেলেমেয়েকে এক সঙ্গে জড়ে করে, এর জন্য তো খরচও আছে। দায়িত্ব করিতে হয়। লাভের কথা চিন্তা না করে কি চতুর্ভুজের মতন মনুষ কিছু করে?

— লাভটা কী বুঝলি না? চতুর্ভুজের আসল পঁয়সা হচ্ছে ড্রাগ। কালদ্বীপের কাছে ওর একটা মন্ত্র বাগানবাড়ি আছে। সেখানে মাঝে মাঝে শুটিং হয়। আবার এই সব নতুন

ছেলেমেয়েদের নিয়ে মিটিং হয়। আমি একবার গিয়েছিলাম বুঝলি! গিয়ে দেখি, সিনেমা-চিনেমা ফালতু, আসলে ড্রাগের নেশার সেট। একটা তীর্থস্থান চতুর্ভুজ ভালো ভালো বাড়ির ছেলেমেয়েদের ঐ বাগান বাড়িতে টেনে এনে ড্রাগের নেশায় দীক্ষা দেয় একবার নেশা ধরে গেলে এই সব ছেলেমেয়েরাই তাদের বন্ধু-বন্ধবদের আবার দলে টানবে। এই ভাবে ড্রাগটা ছড়াবে। অর্থাৎ একদল ছেলেমেয়েকে একবার ড্রাগের নেশাটি ধরিয়ে দিলে তারপর তাদের মধ্যে অনেকে পরে আড়কাঠি হয়ে যাবে, বুঝলি!

—না, বুঝলাম না।

—তোকে তো আমি সহজভাবে বুঝিয়ে দিলাম, নীলু!

—তোর কথাগুলো বুঝেছি। বিশ্বাস করতে পারছি ন। একজন সুই, সভ্য, ভদ্র চেহারার মানুষ, সে একদল অল্পবয়েসি সরল ছেলেমেয়ে সর্বনাশা ড্রাগের নেশায় ঠেলে দিচ্ছে, তাদের জীবনটা ধ্বংস করে দিচ্ছে, এটা কি বিশ্বাস করা যায়!

—পৃথিবীটা দিন দিন বড় কঠিন জায়গা হয়ে যাচ্ছে রে! পয়সার জন্য মানুষ করতে পারে না এমন কোনো কাজ নেই! ভাড়াটে খুনী পাওয়া যায়, তা জনিস? তোর সঙ্গে কোনো শত্রুতা নেই, ঘণ্টা নেই, তোকে চেনেও না, জাস্ট কিছু টাঙ্কার দিনিময়ে তোকে একজন এসে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে যাবে।

—কাকঢ়ীপের কাছে বাগানবাড়ি, তুই সেখানে গেছিস? ক নাম রে বাড়িটার?

—যাবো না কেন? আমাকে ছবি ভুলতে ডেকেছে। সেই সব ছবি ভাঙিয়েও ওরা কিছু রোজগার করে। বাড়িটার নাম কিছু আছে কিনা জানি না। চারদিক উচু পাঁচিল দিয়ে যেরা। বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না। স্থানীয় লোকেরা বলে শেষদের বাগান। সেখানে আমাকেও ড্রাগ ধরবার চেষ্টা করেছিল। সে জন্যই তো তোকে বলছি, নীলু, চতুর্ভুজ শেষ ডেঞ্জারস লোক, চন্দনদার মেয়ে যেন ওর পাল্লায় না পড়ে।

ওসব সিনেমা-ফিলেমা বাজে ব্যাপার। ওকে তুই বারণ করে দে।

আমার থুতনি বুকে ঠেকে গেছে। আমি যেন আর কথা বলতে পারছি না। ভাঙ্গা গলায় বললাম, আমার বারণ শুনবে না। শুনবে না। আমি কে?

—চন্দনদাকে বলে দিলে হয় না?

—বললেই বা কী লাভ হবে? চন্দনদা সব সময় মেয়েকে আটকে রাখতে পারবে? চন্দনদাকেই কে আটকায় তার ঠিক নেই!

—চন্দনদার সঙ্গে নীপা বউদির কী হয়েছে রে? কী যেন কানুঘুমে শুনছিলাম!

—ওসব কথা বলতে আমার এখন ভালো লাগছে না

নাঃ, এভাবে আর চলে না। আমি একটা গা-ঘাড়ি দিলাম। চোখ দুর্দুল্লাস কঠলে মিলাম এত জোরে যে জ্বালা করে উঠলো। দুটো হাতের তালু ঘষে গবর্মার নিয়ে বললাম, প্রীতম, যে-জন্য তোর বাড়িতে কাল গিয়েছিলাম, তুই আমাকে ছিশো টাকা ধার দিতে পারবি?

প্রীতমের চোখ দুটি ছানা বড়া হবার মতন অবস্থা হচ্ছে অফিসের বড়বাবুর অশান্ত চেহারার মতন হাত দুটো ওপরে তুলে জিঞ্জেস করলো, কী বললি? কত? আমি কানে ঠিক শুনেছি তো?

আমি দৃঢ় গলায় বললাম, ছশো!

— লাফে তোর কি হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি? আগে কুড়ি-পঁচিশ টাকা চাইতি. এখন এক একেবারে ছ’শো? এমন ভাবে কেউ দাগা দেয়? কুড়ি-পঁচিশের বদলে বড় জোর তিরিশ হতে পারে। সব জিনিসের দাম বেড়েছে, না হয় পায়তিরিশ।

— আজকাল কুড়ি-পঁচিশ টাকা নিলে কেউ শোধ দেয় না। অত কম টাকাকে কেউ ধার বলে না। ছ’শো টাকা হচ্ছে খাটি ধার।

— পাঁচশো নয়, সাতশোও নয়। ঠিক ছ’শো কেন?

— ঐ টাকটিই আমার মনে এসেছে। পাঁচশো চাইলেও তুই বলত, চারশো কিংবা তিনশো নয় কেন! আমি ছ’শো টাকা ধার চাইছি, ঠিক ছ’মাস বাদে শোধ দিয়ে দেবো।

— জ্যায়? তুই কি ধার শোধ দিয়ে গিনেস বুক অফ রেকর্ডসে নাম তুলতে চাস নাকি?

— দ্যাখ প্রীতম, ফটোগ্রাফার হিসেবে রমরমা হবার আগে, তুই-ও আমার কাছে প্রায়ই খুচরো টাকা ধার নিতিস, সে সব যোগ দিলে খুব কম হয় না।

— ছিঃ নীলু। সে তো অনেকদিন আগৈ। বঙ্গুরাঙ্কবের মধ্যে অত পুরোনো কথা তুলতে নেই।

— আমি তা তুলতে চাই না। এখন থেকে পরিষ্কার শ্রেণ্ট। আগেকার সব কিছু মুছে গেছে। তুই এই টাকাটা দিলে শোধ পেয়ে যাবি।

— এত টাকা নিয়ে কী করবি তুই?

— সেটা ধার দেবার কোনো শর্ত হতে পারে না। আমার যা খুশি করবো। ইচ্ছে হলে একদিনে ওড়াবো। তুই যদি টাকাটা দিতে না চাস, তা হলে আমি..

— তা হলে কি তুই আঘাত্যা করবি?

— বছর আঘাত্যা করে কিছু লোককে খুশি করতে চাই না ভাই; তুমি টাকাটা না দিলে এ ঘরে যত বই দেখছো, সব কলেজ স্টিট্রে পুরোনো বইয়ের দোকানে বিক্রি করে দেবো। তাতে নিশ্চয়ই ছ’শো টাকা পাওয়া যাবে।

— ওরে বাবা, সেটাও তো তোর আঘাত্যার সমানই হবে বলতে গেলে। তা হলে ছ’শো টাকা না নিয়ে তুই ছাড়বি না? দেখি, যদি থাকে

প্রীতম সত্যিই বেশ অবস্থাপন্ন হয়েছে। এত টাকা সে নিজের কাছে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়!

প্যাটের পকেট থেকে সে একটা সাদা খাম বার করলো। তার থেকে যত্ন করে শুনে ছ’খানা একশো টাকার নেট আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, আমার কাছে আর দু’তিনশো রইলো মাত্র।

আমার কানে দয়াস দয়াস করে দুটো শব্দ লাগলো, ‘র্দেব’ আর ‘য়দি’। তার মানে পকেটে কত টাকা থাকে, তা ওরা হিসেব রাখে না। নিশ্চয়ই অন্য পকেটে আর একটা সাদা রঙের খাম আছে। এগুলোই কি কালো টাকা? শুধু সাদা খামের কালো টাকা রাখতে হয় বুঝি!

আমাকে নেটগুলো দেবার পরও সে বলতে পারে দু’তিনশো বাকি রইলো। অর্থাৎ দুশো আর তিনশো প্রায় একই।

প্রীতম এ আলোচনা আর চালাতে চায় না সেজে খাট থেকে নেমে পড়ে বললো, এবার চলি রে, নীলু!

আমার হাতে এখন অনেক টাকা! এখন নিশ্চিন্তে দিকশূন্যপুরে যেতে পারি।

মুমু আজ একটা বিচিত্র পোশাক পরেছে। এর নাম চুড়িদার আর কাফতান। এরকম পোশাক কিছু কিছু যেয়েকে পরতে দেখি, নাম-টাম জানতাম না। গলা থেকে প্রায় পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ময়ুরকষ্টী রঙের জামাটা মুমুর সারা গায়ে যেন টেউ খেলছে।

মুমুর সঙ্গে একটা বোলা ব্যাগ, তাতে আরও কিছু পোশাক আছে। একটা রাত থাকতে হবে তো?

রাত্তিরে বৃষ্টি হয়েছে, সকালটা বেশ বলমলে কিন্তু গরম নেই।

ওদের বাড়ি থেকে বেরুবার পর একটুখানি এগিয়ে আমি জিজেস করলাম, মুমু, ওখানেই যেতে হবে, নাকি আমার সঙ্গে দিকশূন্যপুরে যাবি?

মুমু ভুয়ে কুঁচকে বললো, দিকশূন্যপুর? সেখানে কী আছে?

আমি বললাম, সেখানে বাতাসে কোনো ধোওয়া নেই। ফুলের গন্ধ মাঝা বাতাস। মানুষগুলো চমৎকার। কেউ কারণকে হিংসে করে না, ঝগড়া ব্যাপারটাই জানে না। কেউ আপন মনে গান গায়, অন্যরা শোনে। কেউ আপন মনে ছবি আঁকে, সবাই দেখে। কেউ বাগান করে। সেখানে ইচ্ছে করলে যে-কেউ গিয়ে ফল খেতে পাবে, লাঠি হাতে কোনো দারোয়ান তাড়া করবে না।

— বুড়ো-বুড়িদের জায়গা?

— না, না, অনেক কমবয়সিগ আছে।

— আমার বাবাকে আর মাকে নিয়ে যাও। দ্যাখো যদি ওদের ঝগড়া ভুলিয়ে দিতে পারো।

— নিয়ে যাবো, ওদেরও নিয়ে যাবো একদিন। আজ তুই চল না! এখান থেকে সোজা হাওড়া টেশনে গিয়ে টেন, বিকেলবেলা এক জায়গায় নেমে পড়ে কিছুটা বাসে যেতে হবে, তারপর জঙ্গলের মধ্য দি঱ে ইঁটতে ইঁটতে একটা নদী...গেলে তোর খুব ভালো লাগবে।

— তুমি যাও; আমি পিকনিকে যাবো বলে কথা দিয়েছি। সবাই অপেক্ষা করবে।

— ও হ্যাঁ, তালো কথা। তোদের পিকনিকের কত চাঁদা?

— ছেলেদের দুশো টাকা, মেয়েদের কিছু লাগবে না।

— কেন, মেয়েরা বুঝি কিছু খাবে না?

— ওহে হাঁদারাম, মেয়েরা যা খুশি, যত ইচ্ছে খাবে। কিন্তু সব মেয়েদের চাঁদা একজন দিয়ে দিয়েছে।

— কেন দিয়েছে?

তাঙ্গে ওয়েছে বলে দিয়েছে। শিভালরি বলে একটা কথা আছে জানো না? ও শিভালরি ইংরিজ? তোমাদের বাংলায় শিভালরিকে কী বলে?

— বাংলাটা বুঝি আমাদের ভাষা? তোর ভাষা নয়?

— কথা ঘোরাছো কেন? শিভালরির বাংলা কী?

— সব ইংরিজি কথার বাংলা থাকতে হবে, তার কী মানে আছে? সব বাংলা কথার কি ইংরিজি হয়? অভিমান-এর ইংরিজি কী? তেমনো চিচারদের জিজেস করিস তো। আমাদের তো আর মধ্য যুগের নাইট ছিল না, অহি শিভালরির মতন কথাও তৈরি হয়নি। তবে মেয়েদের প্রতি পুরুষদের অদ্রতার ব্যাপারটা ঠিকই আছে।

পকেট থেকে একটা খাম বার করে তার থেকে কড়কড়ে দুটো একশো টাকার নোট বার করে বললাম, এই আমার চাঁদা, ওদের দিয়ে দিস।

মুমু অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললো, তুমি টাকা দিচ্ছে কেন? তুমি তো পিকনিকে যাচ্ছে না?

— যাচ্ছি না মানে? নীপা বউদিকে বলে এলাম —

— তুমি আমাকে ভিজে'র কাছে শুধু পৌছে দেবে। ব্যস, তারপর আর তোমাকে কিছু কারতে হবে না। তারপর কাল রাত দশটার সময়...

— আ-হা-হা! তোর বাবা-মা বিশ্বাস করে আমার সঙ্গে তোকে পাঠিয়েছে। এখন আমি তোকে মাঝ রাস্তায় ছেড়ে দেবো? ওরকম বিশ্বাসঘাতক আমি হতে পারবো না।

— এই নীলকা, শোনো। ওরা তোমাকে নেবে না।

— কেন, নেবে না কেন, আমি চাঁদা দিচ্ছি।

— এটা খুব সিলেকটেড গ্যাদারিং। আমাদেরই বঙ্গ-টঙ্গুরা, তোমাকে এর মধ্যে মানবে না, তুমি তো বুড়ো।

— একটা চাঁচি খাবি। আমি বুড়ো। তোর বঙ্গ অনুপম আমার থেকে মাত্র পাঁচ বছরের ছোট। আমার থেকেও বেশি বয়েসি লোকেরা ওখানে থাকবে, এটা আমি বাজি ফেলে বলতে পারি।

— ওখানে আরও একটা ব্যাপার আছে। সত্যি বলছি, তোমার যাওয়া চলবে না।

— জানি, কী ব্যাপার আছে। সিনেমার জন্য স্ক্রিন টেস্ট। পার্ট বলা। 'রাজার মেয়ে ভিখারিনী'। আমিও সেই পরীক্ষা দেবো। পাস না করতে পারি পরীক্ষা, দিতে ক্ষতি কী?

— তুমি কী করে জানলে?

— আমি জেনে যাই, অনেক কিছু জেনে যাই। শোনো ভাই, একটা সোজা কথা বলি। তোমার মা-বাবা বিশ্বাস করে তোমাকে আমার সঙ্গে ছেড়েছেন, সুতরাং এই দু'দিন তোমাকে আমার সঙ্গেই থাকতে হবে, তা তোমার যতই খারাপ লাঞ্চ। না হলে বাড়ি ফিরে যেতে হবে।

— আমি বলেছি, তুমি সঙ্গে থাকলে আমার খারাপ লাগবে? আমি বলেছি, ওরা তোমাকে নিতে চাইবে না।

— আমাকে না নিলে তোমারও যাওয়া হচ্ছে না; মুমু!

— ঢাকুরিয়ায় দক্ষিণাপণের সামনে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে ভিজে অর্থাৎ বিজয়। এই বয়েসি বাঙালি ছেলেদের এখন আর বিজয় নাম হয় না। ঠাকুর্দা ঠাকুর্দা শোনায়। সেই জন্য কি নামটা বিকৃত করে নিয়েছে?

ষিয়ারিং-এ বসেছে বিজয়, তার পাশে একটি নতুন ছেলে।

আমি পেছনের দরজাটা খুলে বললাম, কী খবর বিজয়! ভালো তোমার জামাটা চমৎকার।

বিজয় আড়ষ্ট ভাবে মুমুর দিকে তাকালো।

মুমুও একই রকম আড়ষ্ট ভাবে ইংরেজিতে বললো, আমার নীলকা আমাদের সঙ্গে যেতে চাইছে। ইনি সঙ্গে না এলে আমি বাড়ির অনুমতি দেতাম না।

আমি ততক্ষণে গাড়িতে চুকে বসে পড়েছি।

বিজয়ও ইংরেজিতে বললো, আমার গাড়িতে তো জায়গা হবে না। রাস্তা থেকে আর একটি মেয়েকে তুলতে হবে।

আমি 'ওকে উৎসাহ দিয়ে বললাম, ইঁয়া, ইঁয়া, তাতেও জায়গা হয়ে যাবে। ছোট মানুষত্তে পাঁচজন ধরে যায়। আয় মুমু, উঠে আয়, দেরি করে লাভ কী?

খুব অনিষ্টার সঙ্গে বিজয় গাড়িতে স্টার্ট দিল ।

তার পাশে যে ছেলেটি বসে আছে, সে ঘাড় ঘুরিয়ে বললো, নমস্কার। আমার নাম অরিন্দম পারিখ ।

আমি চমৎকৃত হলাম! অ্যারিনডাম না বলে পরিষ্কার অরিন্দম বললো? এ ছেলেটি কে, দৈত্যকুলে প্রহাদ?

আমি বললাম, তুমি তো বেশ সুন্দর বাংলা বলো!

মুমু বললো, তুমি জানো না, নীলকা, অরিন্দম হায়ার সেকেভারিতে বাংলায় ফার্স্ট হয়েছিল!

অরিন্দম বিনীত ভাবে বলল, আমরা অনেকদিন কলকাতায় আছি।

কিমার্চর্য অতঃপরম! অবাঙালী ছেলে বাংলায় ফার্স্ট হচ্ছে, আর এখানাকার অনেক বাঙালি ছেলেমেয়ে বাংলা শিখতেই চাইছে না

মনোহরপুরুরের মোড়ে একটা বাড়ির সামনে দু'বার হৰ্ণ দিতেই একটি মেয়ে নেমে গোলো। শাড়ি পরা, মুখে উঁগ মেক আপ। মেয়েটি মুমুর চেয়ে অনেক বড়, প্রায় আমার কাছাকাছিই বয়েস হবে। সে এসে বসলো মুমুর পাশে।

মেয়েটির চোখের দৃষ্টি চুলুচ্ছল মতন! মাথা ঝুকিয়ে আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। অনেকটা আপন মনেই বললো, নীনা সার্কার আমার নাম। এই লোকটি কে?

সার্কার পদবী আমি আগে কথনো শুনিনি। সরকার নাকি?

আমি হাতজোড়া করে বললাম, আমি মুমুর এক কাকা। আমার নাম নীললোহিত। ওর আপন কাকা নিই অবশ্য। এমনিই নীলকা বলে ডাকে

নীনা বললো, নীলকা? আই উইশ আমার একটা নীলকা নামে কাকা থাকতো! আমার কাকা-টাকা কেউ নেই। নীলকা, লালকা? কালকা মেলের মতন শোনায়। নীলকা, লালকা! হলদে হলে কী হবে? হলকা? বাঃ ফাইন। হলকা ইজ মাচ বেটার দ্যান নীলকা!

আমি সন্তুষ্ট হয় উঠলাম। এ মেয়েটা পাগল নাকি?

মুমুও যেন একটু ভয় পেয়ে গেছে। 'সে এই মেয়েটিকে তেমন চেনে না মনে হলো।

বিজয় বললো, নীনাজী, আপনার তবিয়ৎ ঠিক নেই মনে হচ্ছে। একটু ঘুরিয়ে নিন। টেক আ ন্যাপ। অনেক রাস্তা যেতে হবে।

নীনা বললো, আ অ্যাম ফাইন। আই অ্যাম ইন নাইনথ হেভেন। নীলকা, নীলকা, তোমার কাছে আমার আগে দেখা হয়নি কেন? তুমি কোথায় ছিলে?

আমি বললাম, এই মুমু আগে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়নিনি।

নীনা বললো, মুমু! হ ইজ মুমু! এই মেয়েটা তো রোমি! তার একটা ভালো নাম আছে, রেমিয়ানি! মুমু কে?

মুমু আমার দিকে কটমটি করে তাকালো। বাইরের জোকের কাছে ডাকনাম বলে দেওয়া আমার ঠিক হয়নি।

কথা ঘোরাবার জন্য বললাম, এই মনোহরপুর দিয়ে আমি কতবার হেঁটে গেছি, আপনাকে দেখতে পাইনি।

নীনা বললো, সিগারেট আছে? কে আমাকে একটা সিগারেট দেবে?

আমিই প্যাকেট বার করে দিলাম। ধরিয়ে দিতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম, মেয়েটির হাত কাপছে। মদের গন্ধ পাছি না, তা হলে ড্রাগ। এই সকালবেলাতেই নেশা করেছে?

এরপর অনেকক্ষণ লীনা উল্টোপাল্টা কথা বলে যেতে লাগলো। মুমিয়ে পুড়লো এক সময়।

বিজয় বেশ জোরে গাড়ি চালায়। আড়াই ঘন্টার মধ্যে পৌছে গেল কাকদ্বীপের সেই বাগানবাড়ির সামনে। প্রায় দেড় মানুষ উঁচু পাঁচিল দিয়ে যেরা। লোহার গেটে পাঞ্জাবি দারোয়ান।

ভেতরে মন্ত বড় মাঠ, তার এক পাশে বাগান ও পুকুর। এক পাশের বাড়িটি দোতলা। এবং ছড়ানো, ওপরে নিচে টানা বারান্দা ও অস্তত বারো-চোদ্দটি ঘর। পিকনিক করতে এসেছে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন, শোল থেকে বাইশ-তেইশ বছর বয়েসি ছেলেমেয়েই বেশি হলেও কয়েকজন রয়েছে আমার চেয়েও বয়স্ক। চতুর্ভুজ শেঠকে দেখা গেল না কোথাও!

আপনি করা দূরে থাক, আমার দিকে কেউ নজরই দিচ্ছে না। শুধু অনুপম আমাকে দেখে একবার থমকে দাঁড়াল। আমি হেসে বললাম, নো হার্ড ফিলিংস, তাই না? এই নাও, একটা সিগারেট খাও।

অনুপম আগেই চলে এসেছে, ব্যবহারপনা করতে। সে আর বিশেষ কিছু বললো না, চলে গেল। তার সিগারেটের ধার শোধ করে আমি স্বস্তি বোধ করলাম। মুমু মিশে গেছে অন্যদের সঙ্গে, আমি মাঠটার এক ধারে বসলাম একটা গাছের নিচে।

এটা পিকনিক না সিনেমা পার্টি ঠিক বোৰা মুশকিল। পিকনিকের পরিবেশ আছে ঠিকই। একদিকে কয়েকজন বাক্সেটবল খেলছে, দুটো ঘোড়া বয়েছে, পলা করে চড়ছে কেউ কেউ, বাগানে ছোট ছোট দলের গুলতানি চলছে। এই মধ্যে বিরাট এক ধামা ভর্তি মুড়ি-মাখা ও বড় বড় সাইজের বেগুনি নিয়ে এলো দু'জন লোক, প্রত্যেককে শাল পাতায় দিয়ে গেল। দুটি মেয়ে চাহের কেত্তলি আর কাগজের গেলাস নিয়ে ঘুরছে।

আবার, একজন লোকের হাতে ভিড়িও ক্যামেরা, সে ছবি তুলছে বেছে বেছে কয়েকজনের। পাশে একজন স্টিল ফটোগ্রাফার: আমি প্রীতমকে আসতে বলেছিলাম, এলো না। ভীতু কোথাকার। দু'জন লোক একজোড়া ছেলেমেয়েরকে এক কোণে নিয়ে গিয়ে বড় একটা খাতা খুলে পার্টি বলাচ্ছে। এটাই কি সিনেমার পরীক্ষা? মনে হয় যেন ছেলেখেলো।

আমি মুমুর দিকে চোখ রাখছি সর্বক্ষণ। মুমুর খেলায় খুব উৎসাহ বাহেটিবজ খেললো বেশ কিছুক্ষণ। তারপর ঘোড়ায় চড়লো। ঘোড়া ছুটিয়ে আসবাবক একবার এলো এমন ভাবে, যেন আমার গায়ের ওপর দিয়েই চলে যাবে। অফিসিডলাম না। বসে রইলাম স্থির হুয়ে, মুমু হা-হা করে হেসে উঠলো।

যে-সব ছেলেমেয়েরা এসেছে, তারা সবাই অবস্থাপনা পরিবারের, মুখ-চোখের ভাব দেখলে বোঝা যায়। গরিবের ছেলেমেয়েরা যদি কোনো ক্রমে দামি পোশাক জোগাড় করে পরেও, তা হলেও তারা এরকম পরিবেশে সেসব সাবলীল হতে পারবে না। এরা সবাই লেখাপড়া শিখছে। সামনে রয়েছে উজ্জ্বল জীবন! নিছক টাকার লোভে কেউ এদের ড্রাগের নেশা। ধরিয়ে সর্বনাশ করে দিতে চায়? এরা নেশাগ্রস্ত হয়ে আবার অন্যদের টানবে!

মেয়েরা অনেকেই বেশ সুন্দর। কিন্তু আমার চোখে মুমুকেই যেন সেরা মনে হয় কী দণ্ড ভঙ্গিতে ঘুরছে মুমু। এখানকার খোলামেলা জায়গায় ওর রূপ যেন আবৃত্তি থালেছে। অনেক ছেলেই ঘুরছে মুমুর আশেপাশে। অনুপম বিশেষ পাত্তা পাচ্ছে না।

দুপুরের খাওাটা অবশ্য ঠিক পিকনিকের মতন নয়। সবাই এক সঙ্গে বসলো না। একতলার বারান্দার এক ধারে দু'জন ঠাকুর অনেক রকম খাবার নিয়ে তৈরি আছে, যার যথন খুশি পাত পেড়ে খেয়ে নিচ্ছে।

আমি দুপুর একটু গাঢ় হতেই খেয়ে নিলাম; খাবো না কেন, দুশো টাকা দিয়েছি! বড় বড় গলদা চিংড়ি রয়েছে। ভাগ্যস এখন আমার নিরামিষ ব্রত নেই, তা হলে এই চিংড়ি উপেক্ষা করতে হতো। এখানে অবশ্য নিরামিষ তরকারিও রয়েছে তিন-চার রকম, অবাঙালীদের জন্য।

মুমু কিছুতেই খেলো না আমার সঙ্গে। আমাকে বললো, ও সাতখানা বেগুনি খেয়ে ফেলেছে, তাই খিদে নেই। অনেক ছেলেমেয়েরাই খাচ্ছে না। শনেছি, ড্রাগের নেশা যারা করে, তারা কিছু খেতে চায় না, তাই তাদের চেহারা দিন দিন শকিয়ে যায়।

কিন্তু এখানে নেশা করতে তো দেখছি না কারুকে। সারা দুপুর ধরেই খেলাধুলো আর হইচই চললো। বেশ সুন্দর পরিবেশ। ওসব কি সন্দের পর শুরু হবে? রাত্রে থাকার ব্যবস্থা কেন, একটা দিনই তো পিকনিকের পক্ষে যথেষ্ট। এত লোক রাত্রে শোবে কোথায়! ও, কেউ তো ঘুমোবে না, সারা রাত জাগার কথা। রাস্তিরের অঙ্ককারে বেলেছু। শুরু হবে।

এক এক জায়গায় গোল হয়ে বসেছে ছোট ছোট দল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ শুয়ে পড়ছে ঘাসের ওপর, আর উঠেছেই না। কারুর কারুর ইঁটার ভঙ্গিটা একটু সন্দেহজনক। কেউ হাসছে তো হেসেই যাচ্ছে। তা হলে কি ড্রাগের ব্যাপারটা চলছে ভেতরে ভেতরে? কে দিচ্ছে, কী ভাবে দিচ্ছে? সেটা বুঝতে পারছি না। পানওয়ালা টাইপের কোনো লোক তো নেই। চতুর্ভুজ শেঠেরও দেখা নেই।

হঠাৎ এক সময় লীনা এসে বসে পড়লো আমার পাশে।

দেখলেই বোধ যায় ওর নেশার মাত্রা বেড়েছে। এখানে এসে চড়িয়েছে আবার? চোখ যেন খুলে রাখতেই পারছে না। আঁচল খসে খসে পড়ছে বুক থেকে, তাতে ভুক্ষেপ নেই।

জড়ানো গলায় বললো, এই যে ডারলিং, নীলকা! তোমার কিছু হয়েছে?

আমি নিরীহ ভাবে জিজ্ঞেস করলাম, কী হবে?

— তুমি ওপরের ঘরে যাওনি?

— কোন ঘরে?

— নাইন্থ হেভেন! আমি ঘরটার নাম দিয়েছি নাইন্থ হেভেন। আর এই বাড়িটার নাম কী জানো? দা ইন্ অফ সিক্স্থ হ্যাপিনেস! এখানে এসে তুমি চুপ করে এক জায়গায় বসে আছো? তোমাকে বোর্ড দেখাচ্ছে কেন, নীলকা?

— না তোর আমি সব কিছু উপভোগ করছি, জুন্ন দেখছি!

— শুধু দেখবে? খাবে না? চলো আমার সঙ্গে।

লীনার সঙ্গে আর বেশি কথা হলো না, অরিন্দম এস সামনে দাঁড়ালো।

তাকে দেখে আমি তুর পেয়ে গেলাম। সম্পূর্ণ চেহারা বদলে গেছে তার। চোখ দুটো লাল, ফুলে গেছ নাকের পাটা, ঠোটের কষ দিয়ে লালার মতন কী যেন গড়াচ্ছে! ইস, এত সুন্দর ছেলেটিও নেশা করে?

ছেলেটি শুধু বাংলায় ভালো বলেই আমি বুশি হইনি, ওর আরও অনেক গুণ। গাড়িতে আসতে আসতে কথা হলো, খুবই ভদ্র ও বিনীত, চমৎকার গান গায়, সেই ছেলের এমন পরিবর্তন? এরও কি বাবা-মা অমানুষ!

বিকৃত গলায় অরিন্দম বললো, এই লীনা, ইউ বীচ! আমি কত জায়গায় তোকে বুজছি, আর তুই এখানে বসে ঢং করছিস! উঠে আয়! উঠে আয়!

লীনা ফিক করে হেসে বললো, জানো নীর্লকা, হি ইজ মাই ম্যান। সব সময় ধরকায়। তোমার কাছে বসেছি বলে হিসেস হয়েছে।

অরিন্দম আবার একটা কৃৎসিত গালাগালি দিল লীনাকে।

অরিন্দমের এ পরিবর্তন দেখে আমার কান্না পেয়ে গেল। আমি মুখ নিচু করে রইলাম। ও লীনার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল হিড়হিড় করে। লীনার আঁচল লুটোতে লাগলো মাটিতে।

তা হলে দোতলার কোনো ঘর থেকে দেওয়া হচ্ছে! ওপরে আমি উঠিনি একবারও। ড্রাগ জিনিসটা কী রকম দেখতে তাও জানি না। গাঁজা-ভাঙ-চরসের ব্যাপার জানি। কিন্তু এখন নাকি কী সব ট্যাবলেট বা গুঁড়ো গুঁড়ো জিনিস চালু হয়েছে। গাঁজার নেশা ছাড়া যায়। আমি নিজেই তো সিগারেটের মধ্যে ভরে বেশ কয়েকবার গাঁজা টেনে দেখেছি, কই, রোজ খেতেই হবে এমন নেশা তো হয়নি! এই সব কেমিক্যাল ড্রাগ একবার খেলে নাকি ছাড়া খুবই শক্ত। হঠাৎ ছেড়ে দিলে কেউ কেউ মরেই যায়!

সঙ্গের সময় এসে উপস্থিত হলো চতুর্ভুজ শেষ। সঙ্গে দু'জন গুণ্ঠা মতন লোক। ওকে দেখে আমি একটা বস্তির নিঃশ্঵াস ফেললাম। যাক, এসেছে তা হলো? মূল চরিত্রটি না এলে কী নাটক জয়ে?

লোকটা আমাকে অল্পক্ষণের জন্য দেখেছে দিন সাতেক আগে। তাতে কি আমাকে আর চিনতে পারবে? আমার মতন একটা অতি সাধারণ চেহারার ছেলেকে ওর মনে রাখার কোনো কারণ নেই। চতুর্ভুজের ছাগলদাঢ়িওয়ালা মুখ একবার দেখলেই সকলের মনে থাকে, চতুর্ভুজ! টাকা রোজগারের জন্য চতুর্দিকে হাত বাড়িয়ে আছে।

অঙ্ককার হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে। মাঠে জুলা হয়েছে দুটো ফ্লাড লাইট, তাতে অবশ্য সবটা আরো হয়নি। আমার এ গাছতলাটাতেও আবছা আলো।

চতুর্ভুজ শেষ তার সঙ্গীদের নিয়ে ঘুরছে এদিক ওদিক। এক একটা দলের মাঝখানে গিয়ে কথা বলছে। মাঝে মাঝে হেসে উঠছে হা-হা করে। বেশ ফুটিত্তেই আছে। ওর জালে আজ অনেকগুলো সরল, শুক্র ছেলেময়ে ধরা পড়েছে। এরা কর্যেক মাসের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যাবে। তাতেই একটা লোকের আনন্দ।

চতুর্ভুজ নিজে কি ড্রাগ নেয়? ওর চলাফেরার মধ্যে একটা গটগটে ভাব, তাতে মনে হয় না যে নেশা করেছে। ময়রা নিজে মিষ্টি খায় না!

একবার প্রীতম আমাকে একটা অফিস-পিকচারে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে দেখেছি বীয়ারের বোতলের ছড়াছড়ি। এখানে মদের কোনো ব্যাপারই নেই। মদের চেয়েও ড্রাগের নেশা এত আকর্ষণীয় হয় কী করে?

অনেকগুণ মুমুক্ষে দেখতে পাওছি না। এই অস্কারের মধ্যে এখন আর ওর ওপর নজর বাধাও সম্ভব নয়। আমি তো আর জোর করে ওকে আমার পাশে বসিয়ে রাখতে পারি না! মুরুক না ও অন্যদের সঙ্গে। আমি এখানে মুমুর সঙ্গে প্রেম করতে আসিনি।

দূরের বাড়িটায় একতলা ও দোতলার বারান্দায় আলো জুলছে। দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠে যার বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, তাদের আমি এখান থেকে স্পষ্ট দেখতে পাওছি। মুমু ওখান দিয়ে যায়নি ওখানেই কোথাও আছে লীনার নাম দেওয়া নবম স্বর্গ।

কেউ এখন আর জোর কথা বলছে না। এত মানুষ, তবু একটা চুপচাপ ভাব। ঘোড়া দুটোকে যেন নিয়ে গেছে কোথায়। ভিডিও ক্যামেরার ছবি তোলার জন্য আলো ঝলসে উঠলো বাগানে।

আমি ভেতরে ভেতরে একটা দারুণ অস্ত্রিতা বোধ করছি। এখন ক'টা বাজে? সাড়ে সাতটা, পীনে আটটা হবে নিশ্চয়ই। আমি শুনেছি, ড্রাগ যারা নয়, তারা এর বেশি আর দেরি করতে পারে না। সঙ্গে হওয়ার সঙ্গে ড্রাগের নেশার একটা সম্পর্ক আছে। বিদেশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ড্রাগের নেশার কথা কাগজে পড়ি, কলকাতাতেও যে এরকম একটা চক্র আছে, তা আমি আগে কল্পনাও করিনি।

ঐ বাড়িটার একতলার সিঁড়ির কাছে মুমু না? দোতলায় উঠছে?

আমি একটা দৌড় লাগালাম।

মুমুর পাশে অনুপমেরই বয়েসি একটি ছেলে, কিন্তু সে অনুপম নয়। মুমুর হাত ধরে আছে। আমি ঠিক ওদের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

মুমু বললো, না, আমি ঐ সব খাবো না। আমাকে এক্ষুনি পার্ট মুখস্থ করার জন্য ডাকবে।

ছেলেট বললো, একটুখানি খেয়ে দেখো। জাট আ লিটল বিট। দেখবে মেজাজটা কী করম ফুরফুরে হয়ে যাবে। কম্পিউটলি রিল্যাক্সড।

—যদি কেউ গুঁজ পায়?

—কোনো গুঁজ নেই। টুপ করে মুখে ফেলে দেবে, কেউ কিছু টের পাবে না। একটু পরে দেখবে, তোমার মনে হবে, দুনিয়াতে কাঙ্গকে পরোয়া করি না।

—না, আজ্ঞ থাক। কাল খাবো। এখন না

—বলছি তো, একটুখানি ফর হাই সেক। তুমিও খাবে, আমিও খাবো

—যদি পার্ট বলতে গিয়ে ভুলে যাই!

—আরে রাখো তো পার্ট-ফার্ট! ভুল হলেই বা কী। তুমি তা অলরেডি সিলেকটেড! আমি তোমার পার্ট দিয়েছি অম্যার কথায় সব হবে।

এ ছেলেটাই তা হলে আড়কাঠি। মুমুর মতন এক একজনের হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে নবম স্বর্গে।

দোতলায় উঠে মুমু আবার আপত্তি জানালো।

ছেলেটা এবার তার হাত ধরে জোর করতে লাগলো।

আমি এগিয়ে এসে বললাম, এই, ওকে ছেড়ে দাও!

ছেলেটি কুটিল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি কে?

—আমি যে-ই হই না কেন, ওকে তুমি জোর দিয়ে কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছো?

—জোর তো করিনি, ও আমার সঙ্গে যাচ্ছে।

—ওর হাত ছাড়ো আগে।

— আরে এ কে? রোমি, হ্যাঁ ইজ দিস গাই?

মুমু চুপ করে আছে। এই ছেলেটা পার্ট দেবার মালিক বলে ওকে পুরোপুরি চট্টাতে চাইছে না?

— ছেলেটা মেশা করেছে, গায়েও বেশি জোর নেই ওকে মাঝারি গোছের একটা ধাক্কা দিয়ে ধরকে বললাম, বলছি না, হাত ছাড়ে! ওর!

এই সময় সিঁড়িতে তিন-চার জোড়া জুতোর শব্দ হলো। অনুচর নিয়ে দপদপিয়ে উঠে এলো চতুর্ভূজ শেষে।

আমি তাড়াতাড়ি দেওয়াল সেঁটে দাঁড়ালাম। যেন ওর প্রতি সন্তুষ্ম দেখাচ্ছি। মুখটা কাত করে রাখলাম, যাতে ভালো করে দেখতে না পায়।

কিন্তু চতুর্ভূজ শেষের তীক্ষ্ণ নজর। সকলের দিকে তাকাতে তাকাতে এগোতে লাগলো। মুমুর গাল টিপে দিল আদরের ছলে। তারপরই দেখলো আমাকে।

থমকে দাঢ়িয়ে বললো, ইউ! তোমাকে আগে দেখেছি। তোমাকে কে এখানে আসতে দিয়েছে?

মুমু বললো, হি ইজ মাই আংক্ল!

চতুর্ভূজ বললো, আংক্ল? হাঁ, আংক্ল! আংক্ল তো কী হয়েছে? এখানে ঢুকতে দিয়েছে কে?

আমি বললাম, আমি চাঁদা দিয়েছি।

চতুর্ভূজ মুখ ভেংচে বললো, চাঁদা! শীট! এসব লোক এখানে অ্যালাট্ট না! যাও, বেরিয়ে যাও!

তার পাশের লোকগুলোর চোখ দেখে মনে হলো, তারা আমাকে আর এক মিনিট মাত্র সময় দেবে।

আমি বললাম, চল মুমু! এখানে আর থাকা হবে না।

চতুর্ভূজ গর্জন করে বললো, নো! ও যাবে না। ও ফিল্ম ইউনিটে আছে। রাস্তারে অনেক কাজ আছে।

আমি বললাম, তার মানে? ওকে আমি সঙ্গে এনেছি। ওকে একা রেখে যাবো? কক্ষনো না!

— ও ফিল্মে কাজ করতে রাজি হয়েছে। ও থাকবে। আমরা ওকে পৌছে দেবার ব্যবস্থা করবো। ইউ গেট দা হেল আউট অফ হিয়ার!

— ওকে না নিয়ে আমি যাবোই না।

— তুমি যাবে না তোমার ঘাড় যাবে!

আমি মুমুর দিকে তাকালাম। এক মিনিট সময় ফুরিয়ে গেছে। এন্ট্রি ওরা আমার ঘাড়ে হাত দেবে।

মুমু একবার আমার চোখের দিকে, আর একবার চতুর্ভূজের মুখের দিকে দৃষ্টি রাখলো। তারপর আস্তে আস্তে ঘাড় নেড়ে বললো, না, আমার কাকা চলে গেলে, আমি ওর সঙ্গে যাবো না। আমি ওর সঙ্গে যাবো।

মুমু যদি সেই মুহূর্তে একথা না বলতো, তবে আমি আস্থাহত্যা করতেও রাজি ছিলাম। চতুর্ভূজ মুমুকে বললো, তুমি ফিল্ম টেলিভিজন্য রাস্তারে থাকবে না!

মুমু এবার বেশ জোর দিয়ে বললো, না!

চতুর্ভূজ দাঁত দাঁত চেপে বললো, তবে যা, তোরা দু'জনেই দূর হয়ে যা!

তারপর অকারণে, সম্পূর্ণ বিনা প্ররোচনায় সে আংটি পরা বাঁ হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে আমাকে দারণ জোরে একটা চড় কষালো।

আমি ছিটকে গিয়ে পড়লাম বারান্দার রেলিং-এ।

কিন্তু আমার একটুও লাগলো না, অপমান বোধও হলো না। আনন্দে বুকটা ভরে গেল। নিচের মাঠের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো, চতুর্ভুজ শেষকে আমি ঐ চড়ের শোধ দিতে পারবো এবার।

বড় বড় টর্চ জ্বেল নিচের মাঠে এসে দাঁড়িয়েছে দশ-বারোজন পুলিশ। তাদের মাঝখানে ডি আই জি নজরুল ইসলামকে চেনা যাচ্ছে স্পষ্ট।

নজরুল ইসলাম সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বললেন, চতুর্ভুজ শেষ, তোমার লোকদের বলো যেন কেউ কোনো জিনিসে হাত না দেয়। কিছু সরাবার চেষ্টা না করে। আমাকে গুলি চালাতে বাধ্য করো না।

ডি আই জি সাহেব কথা রেখেছেন।

## ॥ ১০ ॥

বাড়ি থেকে বেরহওতেই লালুদা আমাকে ধরে ফেললো।

আর এক মিনিট পরে এলেও আমি বাসে উঠে পড়তে পারতাম। কিন্তু লালুদা ঘ্যাচ করে তার গাড়িটা আমার পাশে থামিয়ে দরজা খুলে বললো, আরে নীলমাধব, ওঠো, ওঠো, কোথায় যাচ্ছিলো?

আমি নিচু হয়ে জানলার কাছে মুখ নিয়ে বললাম, হাওড়া টেশন। আপনাকে পৌছে দিতে হবে না।

লালুদা বললো, আরে ধূৎ! হাওড়া টেশনে কে যাচ্ছে এখন! মেয়েটা নার্সিং হোমে শুয়ে কাতারাচ্ছে, তোমার নাম ধরে ডাকছে বারবার, আর তুমি চললে হাওড়া টেশন!

পেছনে অন্য গাড়ি হৰ্ন দিচ্ছে, রাস্তা জ্যাম হয়ে যাচ্ছে, আমাকে উঠে পড়তেই হলো।

লালুদা বললো, বাড়িতে ফোন রাখো না কেন? এই রকম এমারজেন্সির সময় তোমাকে পাওয়া যায় না।

এমন কিছু এমারজেন্সি নয়। মুমু পা ভেঙে নার্সিং হোমে ভর্তি হয়েছে। আমি খবর নিয়েছি, সাধারণ ফ্র্যাকচার, মাস দেড়েক লাগবে সারতে, ভয়ের কিছু নেই। নার্সিং হোম থেকে দু'একদিনের মধ্যেই ছেড়ে দেবে।

মুমু পা ভেঙেছে নিজের দোষে।

কাগজে পড়েছিলাম, নারকেটিক্স শাখার ডি আই জি একজন সাহসী পুলিশ অফিসার। অনেক জায়গায় হানা দিয়েছেন। নিজের দফতরের কয়েকজন তুসিৎ কর্মীকেও সাম্পেন্দ করেছেন তাই কপাল ঠুকে দেখা করতে গিয়েছিলাম তাঁর মুকুল। সব কথা শুনে বলেছিলেন, আম চতুর্ভুজ শেষের কথা জানি। হাতেনাতে ধরিয়ে দিতে পারবেন? আমি কিন্তু নীললোহিতের দু'একখানা বই পড়েছি। যদি আপনার বানানো গুরু হয়, তা হলে কিন্তু আপনাকেই অ্যারেষ্ট করবো।

ঠিক সময়ে অকুস্তলে উপস্থিত হয়ে নজরুল ইসলাম প্রৱশেরই সম্মান বাঁচিয়েছেন।

চতুর্ভুজ শেষ এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গরা ধরা পড়েছে অনেকে। পুরোনো মেশাখোর কয়েকজনকে আটকে রেখে বাকিদের সেদিন ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। সবই ঠিকঠাক ছিল, শেষ মুহূর্তে একটা গঙ্গোল হয়ে গেল। কেইকিসে ফিরবে এ নিয়ে একটা বিশ্বজ্ঞালা চলছে, এই সময় অনুপম মুমুকে ডাকলো তার মোটর বাইকে চড়তে। আমি বারণ

করলাম, মুমুক্ষে হাত ধরে আটকে রাখার চেষ্টা করলাম, তবুও শুনলো না। মাঝে মাঝে ও আমার বিকলে বিদ্রোহ না করে পারে না।

অনুপম নেশা করে ছিল, বেহালার কাছে এসে তার মোটর বাইক উল্টে গেল। সৌভাগ্যের বিষয়, অনুপমের তিনটে পাঁজরা ভেঙে গেলেও প্রাণে বেঁচে যাবে। বিপদ কাটিয়ে উঠেছে। এই দুর্ঘটনার মূল্যে হয়তো ও ড্রাগ ছাড়তে পারে।

লালুদা, বললো, নীলকান্ত, তুমি একটা মস্ত ড্রাগ লর্ডকে ধরিয়ে দিয়েছো, তোমার তো লাইফ রিস্ক হে। ওর কোনো স্যাঙ্গত তোমাকে খুন করে দিতে পারে।

আমি বললাম, তারা যদি কোনো নীলকান্তকে খুন করে, তাতে আমার গায়ে আঁচড়ও লাগবে না।

— তুমি পুলিশ প্রটেকশান চাও না কেন?

— আমি কি মন্ত্রী যে পুলিশ পাহারায় থাকবো? তা ছাড়া আমি সে রকম কিছুই করিনি। কোনো কাগজে আমার নাম দেখেছেন? অবশ্য আমার নাম দেখলেও আপনি চিনতে পারতেন না।

— কেনো কাগজে তোমার নাম নেই, তাও তো বটে। তবু কারা যেন বলাবলি করছিল।

— ওসব উড়ো কথায় কান দেন কেন?

— ঠিক ঠিক।

মুমুর ঘরে শুধু নীপা বউদি বসে আছে। অফিস ছুটি নিয়েছে। গতকাল চন্দনদা আমার বাড়িতে এসে অনেকক্ষণ ছিল। এত বড় একটা বাঁকুনি খাবার পর শ্বামী-শ্বামী দু'জনেই আবার মেয়ে সম্পর্কে ব্যন্ত হয়ে পড়েছেন। দেখা যাক, কত দিন থাকে।

এক পায়ে গোদা একটা প্লাস্টার করা, কপালের কাছেও তিনটে স্টিচ দিতে হয়েছে, সেখানে ব্যান্ডেজ, বেশ মজার দেখাচ্ছে মুমুক্ষে।

আমাকে দেখে বেশ কয়েক মিনিট চুপ করে চেয়ে রইলো। দু' চোখে টল টল করছে জল। মুমুর এমন শান্ত ভাবে কাল্পনা, এ এক দুর্লভ দৃশ্য।

খানিকবাদে মুমু বললো, মা, তুমি আর লালুমামা একটু বাইরে দাঁড়াবে? নীলকার সঙ্গে একটা প্রাইভেট কথা বলবো।

নীপা বউদি লালুদাকে নিয়ে চলে গেল।

মুমু একটা হাত তুলে বললো, বু, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো। আমি জানি, তুমি সত্যি কথা বলবে। আমি মাকে বিশ্বাস করি না, ডাঙ্কারকে না, কারণকে না। আমাকে কি সারা জীবন খোঁড়া হয়ে থাকতে হবে?

আমি বললাম, এবারের জন্য না। এবার ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু স্মিস্ট্রির কোনো নেশাখোরের মোটর বাইকে চাপলে সেরকম হবেই!

— তুমি ঠিক বলছো?

— দেড় মাস বাদে তুই লাফাবি!

— তুমি সেদিন বারণ করেছিলে। আমি শুনিনি। তুমি মুশ করেছিলে?

— নিশ্চয়ই রাগ করেছিলাম। তবে এতদিন তো আঙুরাগ পুষে রাখা যায় না।

— বু, তুমি জানো, আমি কার ওপর সবচেয়ে বেশি রাগ করি? কাকে বেশি খারাপ কথা বলি? কাকে বেশি মারিঃ

— হ্যাঁ, জানি।

—আর কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি?

—তা জানি না।

—কাল বাড়ি ফিরে যাবো। তুমি নার্সিং হোমে আর একবারও আসোনি। কাল থেকে  
দু'বেলা আমার কাছে আসবে। আমরা গল্প করবো।

—তা তো হবে না, মুমু। আমি আজই চলে যাচ্ছি যে অনেক দূরে।

—কেন যাচ্ছো? কেন যাচ্ছো, না তুমি যাবে না!

—এখানে আর ভালো লাগছে না যে!

—তা হলে আমি কার সঙ্গে গল্প করবো, ঝগড়া করবো?

—আরো অনেকে আসবে।

হঠাৎ উঁচু হয়ে উঠে আমার গলা জড়িয়ে ধরে পাগলাটে গলায় বলতে লাগলো, বু,  
তুমি যাবে না, যাবে না যাবে না! তোমাকে আমি কিছুতেই ছাঢ়বো না। তুমি কোথাও  
যেতে পারবে না!

এত উত্তেজনায় হঠাৎ ওর আবার ব্যথা লেগে গেল। উৎকরে উঠলো

আমি আস্তে আস্তে ওর হাত ছাঢ়িয়ে ওইয়ে দিলাম। মুমু আবার খুব ছেলেমানুষ হয়ে  
গেছে।

বাইরে অনেক লোকের গলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। আরও কেউ কেউ এসেছে।  
এখন অনেকেই দেখা করতে আসবে। শুধু মুমুর জন্যই নয়, চন্দনা, নীপা বউদির টানেও  
আসবে অনেকে। হাসপাতালেও লোকে খুব সেজেগুজে আসে।

এখানে আমি অপ্রয়োজনীয়। সুন্দর্ন নারী-পুরুষরা এসে আমার দিকে আড় চোখে  
চেয়ে মনে মনে বলবে, এই ছোঁড়াটা আবার কে? মুমুর শিয়ারের কাছে বসে আছে কেন?

মুমু চোখ বুঁজে আছে। আমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলাম। এখন যতদূর ইচ্ছে  
চলে যাওয়া যায়!

## সমাপ্ত